মুনতাকিম মান্নান চৌধুরী

পথ

প্রথম প্রকাশ ফাল্গুন ১৪১৩ : ফেব্রুয়ারি ২০০৭

প্রকাশক : মো. মনির হোসেন খোকা
পারিজাত প্রকাশনী ৬৮-৬৯ প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০
ফোন : ৭১৬-৫০৯৬ ই-মেইল : parijat.prakashani@gmail.com

প্রকাশনা নির্বাহী : শওকত হোসেন লিটু, মোবাইল : ০১৭১১-৯০৬০৪০

প্রচ্ছদ : মাসুক হেলাল

গ্রন্থস্বত্ব : লেখক

বানান সংশোধন : ঝন্টু চৌধুরী

আমেরিকা পরিবেশক : মুক্তধারা, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক
যুক্তরাজ্য পরিবেশক : সঙ্গীতা লিমিটেড, ২২ ব্রিক লেন, লন্ডন

বর্ণবিন্যাস : ঈশিন কম্পিউটার, ঢাকা-১৩১০

মুদ্রণে : হেরা প্রিন্টার্স, হেমেন্দ্র দাস রোড, ঢাকা-১১০০

মূল্য : ৭৫.০০ টাকা

POTH

A Collection of Short Storie's Poth by Muntakim Mannan Chouodhury
Published by Md. Monir Hossain Khoka. Parijat Prakashani
68-69 Pyaridas Road Dhaka-1100 Bangladesh
Phone : 716-5096 e-mail : parijat.prakashani@gmail.com
Publication executive : Showkat Hossain Litu, Cell : 01711-906040
U.S.A. Distributor : Muktadhara, Jacson Hights, New York
U.K Distributor : Sangeeta Ltd. 22 Break lane, London
1st Published in Book Fair 2007

Price : Taka 75.00 US $ 5.00

ISBN 984 800 149 2

বাড়ি

দৃশ্যত আর্ট গ্যালারি থেকে বের হয়ে ফুটপাথে দাঁড়িয়ে ছিলাম একটা ট্যাক্সির আশায়। মেজাজটাই খারাপ হয়ে আছে। আজকাল কি সব ছবি প্রদর্শনী করে–কোনো মাথামুণ্ডু নাই। এগুলোকে আবার মডার্ন আর্ট বলে। হরতালের পর ভেবেছিলাম এখানে ঘুরতে এলে মনটা একটু ফুরফুরে হবে, কিন্তু হলো উল্টোটা। মেজাজ খিঁচড়ে গেছে।

একটাও খালি ট্যাক্সি চোখে পড়ছে না। একটাকে পেয়েছিলাম– কিন্তু ট্যাক্সি ড্রাইভার কিছুতেই মিটারে যাবে না। চল্লিশ টাকা চাচ্ছে এখান থেকে মালিবাগ পর্যন্ত যেতে! আমি অবশ্য খেপে গিয়ে নালিশ করার ভয় দেখিয়েছিলাম, কিন্তু ট্যাক্সিওয়ালা উল্টো চোখ গরম করে জবাব দিয়েছে। "যান, গিয়া কমপ্লেন করেন। দেখি কে আমার কি করতে পারে।"

এই হলো এখনকার ঢাকার পরিবহনের অবস্থা। এ রাস্তায় রিকশাও চলতে দেয় না। এদিকে সন্ধ্যা হয়ে আসছে। মালিবাগে একটা দাওয়াত ছিল।

বেজার মুখ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চলমান ট্রাফিক দেখছি, এমন সময় পেছন থেকে কে যেন পিঠে ধাক্কা দিল। শুনতে পেলাম অনেক দিন আগে শোনা পরিচিত একটি কণ্ঠ, "সাদ না? কেমন আছিস?"

পেছনে ফিরে অবাক হয়ে গেলাম। আরে! এ তো শোভন। আমার কলেজ জীবনের বন্ধু। প্রায় পাঁচ বছর পর দেখা। কিন্তু এই পাঁচ বছর সে যেন বিশ বছর বুড়িয়ে গিয়েছে; আমি খুশিতে তার হাত চেপে ধরলাম।

—"আরে তুই? এতদিন পর? কোথায় ছিলি? তোর চেহারার এ অবস্থা কেন?"

—"আস্তে দোস্ত, আস্তে", শোভন ক্লান্তভাবে হাসল। "সবই সময় পেলে খুলে বলব। আগে তোর কথা বল। কেমন আছিস? এখানে কি করছিলি?"

—"আর্ট গ্যালারিতে প্রদর্শনী দেখতে এসেছিলাম।"

—"আগের অভ্যাস ছাড়িসনি তাহলে?"

তার এই একটি প্রশ্ন আমাকে পুরনো দিনগুলোতে ফিরিয়ে নিয়ে গেল। এক সময় দু'জনে কতই না ঘুরেছি নানা জায়গায়। দু'জনেই শখের আর্টিস্ট ছিলাম। দু'একটা প্রদর্শনীও দু'জনে মিলে করেছিলাম সে সময়।

শোভনের দিকে ভালো করে তাকালাম। একি অবস্থা হয়েছে তার? গাল বসে গিয়েছে, চোখের নিচে কালি। অর্ধেক চুলও পেকে গিয়েছে।

—"চল, কোথাও বসি", তাকে নিয়ে পাশেই একটা ফাস্টফুডের দোকানে ঢুকলাম।

দুটো স্যান্ডউইট আর কোকের অর্ডার দিয়ে খালি টেবিল বেছে বসলাম দু'জন।

"কি করছিস আজকাল", আরাম করে বসে জিজ্ঞেস করলাম।

শোভন কাষ্ঠ হাসি হাসল। "কিছুই না। সারাদিন বাইরে ঘুরে বেড়াই।"

—"তুই বিয়ে করেছিলি না?" কপাল কুঁচকে জিজ্ঞেস করলাম।

—"হুঁ", শোভন টেবিলের কোণা নখ দিয়ে খুঁটতে খুঁটতে জবাব দিল।

—"কি যেন নাম ভাবীর?" আমি মনে করার চেষ্টা করলাম। "ও হ্যাঁ। রীনা। কেমন আছে সে?"

—"সে আর বেঁচে নেই।" শোভন লম্বা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল।

—"বলিস কি?" আমি চমকে উঠলাম। "কবে হলো এটা?"

—"প্রায় এক বছর হতে চলল।"

—"আমি খুব স্যরি দোস্ত", তার কাঁধে হাত রেখে সান্ত্বনার সুরে বললাম। "আমি জানতাম না।"

—"সেটা তোর দোষ না। আমিই তো নিজেকে সবার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়েছি। তুই জানবি কিভাবে?" আমাদের একটা ছোট মেয়েও হয়েছিল।"

—"ও কোথায় এখন?"

—"সেও বেঁচে নেই। রীনা মারা যাবার আগেই সে মারা যায়।" শোভন অন্যদিকে তাকিয়ে বলল।

আমি আঁতকে উঠলাম, "বলিস কি? এত কিছু ঘটে গিয়েছে আর আমি কিছুই জানতে পারলাম না?"

এতক্ষণে বুঝতে পারলাম শোভনের চেহারার এ দশা কেন। শোকে-দুঃখে একরকম শেষ হয়ে গিয়েছে বেচারা।

স্যান্ডউইচ চলে এলো। মোড়ক খুলে স্যান্ডউইচে কামড় দিয়ে বললাম, "তুই থাকিস কোথায় এখন?"

শোভন অন্য স্যান্ডউইচটা মোড়ক খুলে শুঁকে দেখল। তারপর ছোট একটা কামড় দিয়ে এক কথায় জবাব দিল, "মেসে।"

"মেসে?" আমি অবাক হলাম।" তুই না বিয়ের পর পুরনো ঢাকায় একটা বাড়ি কিনেছিলি?"

"আমি ওখানে থাকি না"; শোভন শীতল কণ্ঠে জবাব দিল।

বাড়ির প্রসঙ্গ আনায় শোভনের মধ্যে এই সূক্ষ্ম পরিবর্তনটা আমার চোখে পড়ল। কোনো কারণে সে তার বাড়ির সম্বন্ধে কথা বলতে চাচ্ছে না। তারপরও আমি প্রসঙ্গটা ধরে রাখলাম।

—"ভাড়া দিয়ে রেখেছিস বুঝি?"

—"তারপর?" কোকে চুমুক দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

শোভন চেয়ারে পেছন দিকে হেলান দিয়ে বসল। "বাড়ি দেখে রীনা বেশ খুশিই হয়েছিল। দোতলা বাড়ি। হোক না পুরনো এবং পুরনো ঢাকার বেশ ভেতরে। বাড়ির সামনে আগাছা সাফ করে বাগান করেছিল সে। মিস্ত্রি ডাকিয়ে সিমেন্ট আর চুনকাম লাগানোর পর বাড়িটা কিছুটা হলেও তার চেহারা ফিরে পেল। বেশ ভালোই যাচ্ছিল আমাদের দিনগুলো। পাড়ার অন্যরাও অবশ্য মাঝে মাঝে এসে সাবধান করে যেত, বাড়িটার নাকি কি সব দোষ আছে। আমি সেসব কথা হেসে উড়িয়ে দিয়েছি।"

—"সে সময় থেকে তুই আমাদের কাছ থেকে দূরে সরে গিয়েছিলি।" প্রসঙ্গক্রমে বললাম।

—"হ্যাঁ।" শোভন দীর্ঘশ্বাস ফেলল। "তখন থেকেই আমি কিছুটা হলেও বদলে যাচ্ছিলাম। বদলে যাচ্ছিল রীনাও। প্রথম প্রথম ওর মধ্যে পরিবর্তনগুলো আমার চোখে পড়েনি।"

—"মানে?"

—"ও মাঝে মাঝেই রাতে বারান্দায় বসে থাকত। আমি তখন একটা এন.জি.ও.তে চাকরি করতাম। দিনের শেষে বাসায় ফিরে দেখতাম হয় সে বারান্দায়, নয়তো ছাদে। চুপচাপ বসে আছে। অনেক সময় পেছন থেকে ডাকলে ফিরে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকত। কয়েক মুহূর্তের জন্য চিনতে পারত না আমাকে। এরই মধ্যে আমাদের ঘর আলো করে মিনি এলো।"

শোভন থামল। পুরনো স্মৃতিগুলো তার ভেতরের কষ্টটাকে বাড়িয়ে তুলছে বলে মনে হলো। আমি প্রসঙ্গ ঘোরাবার জন্য বললাম, "তোর বলতে ইচ্ছে না করলে বলার দরকার নেই। আয়, আমরা অন্য কোনো ব্যাপার নিয়ে কথা বলি।"

—"নো, নো।" শোভন মাথা নাড়ল। "কোনো অসুবিধা নেই। কোথায় যেন ছিলাম? ও হ্যাঁ। মিনি জন্মাবার পর রীনা প্রায় স্বাভাবিক হয়ে গেল। তখন তার জগতে আমি, মিনি আর সে ছাড়া আর কেউ নেই। খুব সুখের দিনগুলো কাটছিল আমাদের। তখন....."

—"তখন?"

—"মিনি হবার আগে বাড়িতে কেবল আমরা দু'জনে থাকতাম। মিনি জন্মাবার পর বাসায় একটা কাজের বুয়া রাখলাম। আমারই গ্রামের মহিলা, রহিমা'র মা।

সে-ই প্রথম অভিযোগ আনে আমার কাছে বাড়িটার ব্যাপারে। আমরা থাকতাম দোতলায়। একতলা সাধাণত তালাবন্ধ থাকত। একতলাকে ব্যবহার করতাম স্টোর রুম হিসেবে। রহিমার মা আসার পর তার জন্য একতলার একটা ঘর বরাদ্দ করা হলো। এক মাস পর রহিমার মা এসে জানাল সে এ বাড়িতে থাকতে পারবে না।

—"কেন রহিমার মা?" আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম। –"তোমার অসুবিধাটা কোথায়? বেতন কম মনে হচ্ছে তোমার?"

—"হেইটা কোনো কথা না ভাইজান।" –রহিমা'র মা জবাব দিয়েছিল। "তয় আমি আর এই বাড়িতে থাকতে পারুম না।"

—কিন্তু কেন? আমি জানতে চাইলাম। আমার প্রশ্নের কোনো সুদত্তর রহিমার মা দিতে পারেনি। সে সেদিনই তার বোঁচকা নিয়ে বের হয়ে যায়। এরপর আরও অনেক কাজের লোক রেখেছিলাম, কেউই টিকেনি। তখনো ব্যাপারটা আমি গায়ে মাখাইনি। রীনাও বিরক্ত হয়ে বলল, কাজের লোকের কোনো দরকার নেই। দোতলা সামলাবার জন্য সেই যথেষ্ট। একসময় ঠিক করলাম একতলা ভাড়া দিয়ে দেব। একতলার অবস্থা খুব একটা সুবিধার কখনোই ছিল না। মেঝেতে, দেয়ালে, ছাদে অজস্র ফাটল। মিস্ত্রি ডেকে আনলাম মেরামত করার জন্য। একতলার বেশ কয়েকটা ঘরের মেঝেতে মার্বেল পাথরের টাইলস ছিল। ঠিক করলাম, ওগুলো তুলে ফেলে মোজাইক বসিয়ে দেব। মার্বেল পাথরের টাইলসগুলো বেশ দামেই বাজারে বিক্রি করা যাবে। পূর্ব দিকের কোণের একটা ঘরের টাইলস ওঠার সময় মেঝে খুঁড়তে গিয়েই ঘটনাটা ঘটল। মেঝেতে পুঁতে থাকা পাঁচ-ছ'টা কঙ্কাল পাওয়া গেল।"

—"বলিস কি?" বিস্ময়ে আমার চোখ বড় বড় হয়ে গেল।

—"ঘটনা তো সবে শুরু। থানা-পুলিশ এসে হাঙ্গামা শুরু করে দিল। আগের মালিককে ধরে আনা হলো। দেখা গেল, সেও আসল মালিক নয়। বাড়িটা সে খরিদ করেছিল এক বিহারির কাছ থেকে। সে লোকও অনেক দিন হলো দেশছাড়া। পত্র-পত্রিকাতেও ফিচার বিভাগে বোধ হয় বের হয়েছিল বাড়িটার খবর। যাই হোক, নানা জনে এসে নানা কথা ছড়াতে শুরু করল। রাত-বিরেতে নাকি বাড়িটাতে হাসি-কান্নার আওয়াজ শোনা যায়, ছাদে নাকি কারা হাঁটে। আমি ওদের সব কথা হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলাম। এতদিন ধরে এ বাসায় আছি– কই কখনো তো এসব ঘটনা ঘটেনি। একতলা মোজাইক করা হয়ে গেল। কিন্তু বাড়ির দুর্নাম এতই রটে গিয়েছে যে কেউই বাড়ি ভাড়া নিতে চায় না। অগত্যা একতলার দরজায় আবার তালা ঝুলল। তখনো বুঝিনি, মেঝে খুঁড়ে কঙ্কালগুলো বের করাটাই আমার জন্য কাল হয়ে দাঁড়াবে।"

—"এরপর থেকেই তোরা ভূত দেখা শুরু করলি?" আমি চোখে অবিশ্বাস নিয়ে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

—"ঠিক তা না। তবে, কিছু কিছু ব্যাপার ঘটতে লাগল যার ব্যাখ্যা আমি তখন দিতে পারিনি। সদর দরজা বন্ধ করে শুয়েছি। সকালে উঠে দেখি দরজা হাঁ করে খোলা। মিনির তখন মাত্র তিন বছর বয়স। সে দরজা খুলতে পারবে না। আর রীনাও সারারাত আমার পাশে শুয়ে ঘুমিয়েছে। চোরেরও কাণ্ড নয়, কোনো কিছু খোয়া যায়নি। এমনি ছোটখাটো ঘটনা ঘটত মাঝে মধ্যে। একদিন রীনা এসে আমাকে ধরল।

—তোমাকে সিরিয়াসলি একটা কথা বলব। শুনবে তো?

—কি কথা?

—চলো, আমরা এ বাড়ি ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যাই।

তখন বেশ রাগ হয়েছিল আমার। ওর পীড়াপীড়িতেই বাড়িটা কিনেছি। আর সেই বলছে বাড়িটা ছেড়ে দিতে। বেশ একচোট ঝগড়া হয়ে গেল দু'জনের মাঝে সেদিন। এরপর থেকেই আমার প্রতি তার আচার-আচরণ বদলে যায়। সবসময় দূরে দূরে থাকত মিনিকে সাথে নিয়ে। তার কাণ্ডকারখানা দেখে ওকে নিয়ে গেলাম এক মনোবিজ্ঞানীর কাছে। তিনি উপদেশ দিলেন বাইরে কোথাও ঘুরে আসতে। রীনার আসলে নাকি চেঞ্জের প্রয়োজন। তাঁর কথা শুনে আমরা সবাই কক্সবাজার চলে গেলাম। এক সপ্তাহ সেখানে থেকে ঢাকায় ফিরে এলাম। তার ঠিক এক সপ্তাহ পরে মিনি ছাদ থেকে পড়ে মারা গেল।"

—"কিভাবে ঘটল ঘটনাটা?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

—"সেদিনও আমি অন্যান্য দিনের মতো অফিসে গিয়েছিলাম। দুপুরবেলা রীনা মিনিকে টিভির সামনে বসিয়ে রেখে গোসল করতে গিয়েছিল। তখনি মিনি ছাদ থেকে পড়ে যায়।"

শোভনের গলা ধরে এসেছে। "জানি না কি করে মিনি ছাদে গিয়েছিল। আমরা নিজেরাও ছাদে যেতাম না। ছাদে কোনো দেয়াল ছিল না। পুলিশও বের করতে পারল না সাড়ে তিন বছরের একটা বাচ্চা কি করে দরজা খুলে সিঁড়ি বেয়ে ছাদে চলে যায়। রীনাকেও সন্দেহ করেছিল তারা। কিন্তু শেষমেশ ঘটনাকে নিছক দুর্ঘটনা বলে আখ্যা দিল ওরা। মিনি মারা যাবার পর রীনা আরও অন্তর্মুখী হয়ে গেল। মিনি তার জীবনের সবকিছু ছিল। ঘটনাটা আমাকে যতদূর না নাড়া দিয়েছিল, তার চেয়ে বেশি নাড়া দিয়েছিল রীনাকে। মাঝে মধ্যে খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করে দিত। তারপর আবারও সে ছাদে চুপচাপ বসে থাকা আরম্ভ করল। সে দিনে দিনে আমার কাছ থেকে দূরে সরে যেতে লাগল। তারপর....." শোভন থামল। কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থাকার পর বলল, "গত বছর এক রাতে অফিসের এক সহকর্মী দাওয়াত দিল তার বাসায়। রীনাকে অনেক বুঝালাম, কিন্তু সে কিছুতেই সাথে আসতে চাইল না। অগত্যা আমি একাই গেলাম। রাত দশটার সময় ফিরে দেখি সে একতলার সেই ঘরটাতে পড়ে আছে। হাতের কাছে মেঝেতে পড়ে আছে রক্তমাখা একটা ছুরি, হাতের রগ কাটা। রক্তে ভেসে আছে মেঝে। লোকজন ডেকে হাসপাতালে নিয়ে গেলাম ওকে। কর্তব্যরত ডাক্তার ওকে মৃত ঘোষণা করলেন।"

—"ড্যাম", আমি স্বগতোক্তি করলাম।

—"তারপর আমি ওই বাড়িতে বড়জোর আর এক মাস ছিলাম। চাকরিটাও ছেড়ে দিলাম। ওই এক মাসেই আমি টের পাই বাড়িতে অন্য কারো উপস্থিতির কথা।"

—"অন্য কারো উপস্থিতি? কার?" অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

—"জানি না", শোভন নিরুত্তাপ কণ্ঠে বলল। "জানার চেষ্টাও করিনি। অত সাহস আমার নেই। রীনা সুইসাইড করার পর ভুলেও আমি আর কখনো একতলায় যাইনি। ওখানে কিছু একটা আছে।"

—"বাড়িটা তুই বিক্রি করে দে তাহলে।"

—"কেউ কিনতে চায় না।" শোভন মাথা নেড়ে বলল। "অন্যদের কথা কি বলব, আমি নিজেও গত এক বছর ওই বাড়িটার ত্রিসীমানা মাড়াই না।"

শোভন তার কথা শেষ করার পর আমি একটু চিন্তায় পড়ে গেলাম। শোভনের গল্প আমার বিশ্বাস হচ্ছে না, ভূত-প্রেত বলে কিছু নেই। শোভনের জীবনে এত বড় একটা ঘটনা ঘটে যাবার পর নিশ্চয়ই মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে সে। তাই দু-দুটো মৃত্যুর দায় সে অবাস্তব কোনো শক্তির ওপর চাপিয়ে দিতে চাচ্ছে।

ঘড়ি দেখলাম। অনেক সময় পার হয়ে গিয়েছে। এখন মালিবাগে গিয়ে কোনো লাভ হবে না। তবে বাসায় ফিরতে হবে। উঠে দাঁড়িয়ে শোভনকে বললাম, "আজ তাহলে আসি দোস্ত।"

—"তুই চলে যাচ্ছিস?" শোভন মুখ তুলে তাকাল।

—"হ্যাঁ। বাসায় কাজ আছে।" আমি বললাম। তারপর শান্ত গলায় ধীরে ধীরে বললাম, "আমি বুঝতে পারছি, তুই মনে অনেক বড় আঘাত পেয়েছিস। আমার মনে হয় তোর সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে যাওয়া উচিত।"

—"তার মানে তুই বলতে চাচ্ছিস আমার মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে?" শোভন উঠে দাঁড়িয়ে আমার শার্ট খামচে ধরল।

—"না, আমি তা বলছি না। আমি বলছি তোর এখন সাহায্যের প্রয়োজন।" ওকে বোঝাবার চেষ্টা করলাম আমি।

শোভন কয়েক মুহূর্ত চেয়ে রইল আমার দিকে। তারপর কোনো কথা না বলে রুক্ষভাবে আমাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে গট গট করে হেঁটে বের হয়ে গেল।

শোভনকে আমি ডাকতে গিয়েও থেমে গেলাম। কি লাভ হবে ডেকে। আরেক দিন তাকে খুঁজে বের করে বোঝাতে হবে। দরকার হলে ওর মেসে গিয়ে হাজির হব। তারপর জোর করে ধরে নিয়ে যাব ডা. আলীর কাছে। উনি আমার বেশ পরিচিত।

ফাস্টফুডের দোকান থেকে বের হবার সাথে সাথেই একটা ট্যাক্সি পেয়ে গেলাম। রাত হয়ে গিয়েছে, তাই আর কথা না বাড়িয়ে চুক্তিতে উঠে গেলাম। দশটা টাকা গচ্চা যাবে। কি আর করা।

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙল টেলিফোনের শব্দ শুনে। তুলে দেখি আকবর করেছে। সে আমার আর শোভনের বন্ধু ছিল।

—"খবর পেয়েছিস?" আকবর উত্তেজিত কণ্ঠে বলল।

—"কি খবর?"

—"আমাদের বন্ধু শোভনের কথা মনে আছে?"

—"হ্যাঁ, ওর সাথে আমার গতকাল সন্ধ্যায় দেখা হয়েছে। কেন, কিছু হয়েছে নাকি?"

—"ও আর বেঁচে নেই!"

—"কি বলছিস?" আমার হাত থেকে রিসিভার আরেকটু হলে পড়ে যেত।

—"হ্যাঁ। ওর পুরনো ঢাকায় যে বাড়িটা আছে না, সেখানেই ফাঁস দিয়েছে, আর শুনলে বিশ্বাস করবি না, ফাঁস নেবার আগে পুরো বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয় সে। লোকজন ছুটে এসে যখন আগুন নেভায় ততক্ষণে খুব বেশি দেরি হয়ে গেছে। হি ওয়াজ অলরেডি ডেড।"

আমি ক্লান্ত গলায় বললাম, "সে কি এক তলায় আত্মহত্যা করেছে?"

—"হ্যাঁ! তুই বুঝলি কি করে? আমি তো তাই শুনেছি।"

আমি সে প্রশ্নের জবাব না দিয়ে শোভনের লাশ কোথায় রাখা হয়েছে জেনে নিয়ে রিসিভার রেখে দিলাম। অনেক দেরি করে ফেলেছি। কাল রাতেই ওকে সাথে নিয়ে আসা উচিত ছিল। এখন সে আর বেঁচে নেই, ভাবতেই কেমন লাগছে।

মনের ভেতর একটু দ্বিধাও সৃষ্টি হলো। সে যা যা বলেছিল তা যদি সবই সত্যি হয়? সত্যিই কি ওই বাড়ির কোনো দোষ আছে? যদি ঘটনা সত্যি হয়ে থাকে, তাহলে আর কত জীবন সেই বাড়ি কেড়ে নেবে? শোভন সে কথা চিন্তা করেই হয়তো বাড়িটা পুড়িয়ে ফেলতে চেয়েছিল। হয়তো....

দুর্ঘটনা

—"একটু আস্তে চালা দোস্ত", সালেহিন ঢুলতে ঢুলতে বলল।

আরিফ আসলেই বেশ জোরে গাড়ি চালাচ্ছে। রাত বাজে বারোটা। এত রাতে রাস্তায় গাড়ি-ঘোড়া নেই বললেই চলে। ফাঁকা রাস্তা পেয়েই আরিফ মহাউৎসাহে স্পিড উঠিয়ে গাড়ি চালাচ্ছে। জানুয়ারি মাসের শেষ দিক বলে গাড়ির ভেতর হিটার চললেও বেশ শীত লাগছে।

আরিফ দাঁত বের করে স্টিয়ারিং চাপড় মেরে জড়ানো স্বরে জবাব দিল– "তুই স্পিডের দেখেছিস কি? সামনে খিলগাঁও ফ্লাইওভার। দেখ, গাড়ি কিভাবে উড়িয়ে নিয়ে যাই।"

—"ফর গডস সেক!" সালেহিন অনেক কষ্টে চোখ খুলল। "তুই তিন ক্যান বিয়ার খেয়েছিস। একটু আস্তে চালা!"

আরিফের চোখ জ্বলে উঠল। ক্ষিপ্ত কণ্ঠে জবাব দিল, "আর তুই? তুই খেয়েছিস ক'টা, খেয়াল আছে? বাজে কথা না বলে মুখ বন্ধ করে বসে থাক স্টুপিড কোথাকার।" আমি যখন বলেছি গাড়ি উড়িয়ে নিয়ে যাব, তখন গাড়ি উড়িয়ে নিয়ে যাবোই–"

বলেই আরিফ এক্সেলেটরে চাপ বাড়াল। গাড়ির গতি চোখের নিমিষে আশি থেকে একশ' দশে উঠে গেল। সেটা লক্ষ্য করে সালেহিন দাঁতে দাঁত চেপে ঘোলাটে চোখে আরিফের দিকে তাকিয়ে ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলল–

—"তোর যা ইচ্ছে হয় কর।"

দু'জনেই নেশায় চুর হয়ে আছে। মাত্র কয়েক দিন আগে ওদের ও লেভেল পরীক্ষা শেষ হয়েছে। তাদের বন্ধু ফুয়াদের বাবা-মা শনিবার ব্যাংকক গিয়েছেন। খালি বাড়ি পেয়ে সমানে গিলেছে তিনজন মিলে। ফুয়াদ অবশ্য বলেছিল রাতটা ওর ওখানে কাটাতে। আরিফ তা আমলে নেয়নি।

এখন সালেহিনের নেশাগ্রস্ত চেতনা কিছুটা হলেও আতঙ্কিত বোধ করছে। আরিফ এমনিতেই খুব বেপরোয়া গাড়ি চালায়। তার ওপর আজ সে মাতাল। না জানি কোনো দুর্ঘটনা ঘটিয়ে ফেলে। কিন্তু তাও সালেহিন মুখ বন্ধ রাখল। আরিফের সাথে কথা বলতে একদম ইচ্ছে হচ্ছে না। তার ওপর মনে হচ্ছে মুখ খুললেই সবকিছু বের হয়ে আসবে। কেন যে এত গিলতে গিয়েছিল.... কালকে সকালে নিশ্চয়ই মারাত্মক মাথাব্যথা নিয়ে উঠবে সে।

আরিফ ঝড়ের গতিতে গাড়ি খিলগাঁও ফ্লাইওভারের ওপর ওঠাল। গাড়ির গতি এখন একশ' বিশে। বাঁকগুলোতে সামান্যতম ভুল করলেই সোজা নিচে ছিটকে পড়বে তারা, কিন্তু আরিফের পাকা হাত। মদ্যপ অবস্থাতেই নিখুঁতভাবে ফ্লাই-ওভারের ওপর গাড়ি ছুটিয়ে নিয়ে চলল।

সালেহিনের দিকে আড়চোখে তাকাল সে। তাচ্ছিল্যের হাসি হাসল। মদনটা সিটবেল্ট বেঁধে বসেছে। আরামে চোখ বন্ধ করে ঘুমাচ্ছেও মনে হয়। মাত্র কয়েক ক্যান বিয়ার খেয়েই এই অবস্থা। যদিও সালেহিন আরিফের চেয়ে বেশি পান করেছে, কিন্তু আরিফ সালেহিনের জায়গায় হলে কখনোই এতটা কাহিল হয়ে যেত না। ব্যাটা ভোদাই! স্টিয়ারিং এক হাতে ধরে অন্য হাত দিয়ে সজোরে সে সালেহিনের বুকে চাপড় মারল।

—"ওঠ গাধা, ঘুমাচ্ছিস কেন?"

মাত্র কয়েক সেকেন্ডের জন্য রাস্তা থেকে চোখ সরিয়ে নিয়েছিল আরিফ। এই অল্প সময়ের মধ্যেই কিছু একটা আচমকা গাড়ির সামনে ফ্লাইওভারের ওপর এসে হাজির হলো এবং কিছু বুঝে ওঠার আগেই কানে তালা লাগানো শব্দ করে গাড়ি সজোরে জিনিসটাকে আঘাত করে পথচ্যুত হয়ে ছিটকে গেল ফ্লাইওভারের একপাশে।

আরিফ প্রাণপণে স্টিয়ারিং ঘোরাবার চেষ্টা করল। গাড়ি পিছলে ফ্লাইওভারের প্রান্তে চলে যাচ্ছে, টায়ার পোড়ার কটু গন্ধ চারদিকে। সালেহিন বিস্ফারিত চোখে দেখল ফ্লাইওভারের রেলিং ক্রমশ তাদের সামনে চলে আসছে।

স্টিয়ারিং ঘোরাতে ঘোরাতে সর্বশক্তি দিয়ে ব্রেক কষল আরিফ। ঠিক শেষ মুহূর্তে গাড়িটা ঘুরে ফ্লাইওভারের একপাশে থমকে দাঁড়াল। আর একটু হলেই রেলিং ভেঙে নিচে পড়ে যেত তারা!

সালেহিন সামনের ড্যাশবোর্ডে ঘুষি মেরে চিৎকার করে উঠল, "What in the name of hell.....? কিসে বাড়ি মেরেছিস তুই?"

আরিফ বুক ভরা লম্বা শ্বাস নিল। স্নায়ুর ওপর মারাত্মক চাপ পড়েছে। বুক হাপড়ের মতো ওঠানামা করছে, গা ঘামে একদম ভিজে গেছে। বুকের ভেতর যেন দমাদম হাতুড়ি পেটাচ্ছে। নেশার ঘোরও কেটে গেছে নিমিষে। কাঁপতে কাঁপতে সে গাড়ি থেকে বের হলো।

—"ওহ্ গড!" আরিফ চাপা স্বরে বলল।

—"কি? কি?" সালেহিন বেশ কয়েকবার চেষ্টার পর সিটবেল্ট খুলতে পারল। নেশা তারও কেটে গেছে। গাড়ির দরজা খুলে পেছনে তাকাতেই তার চোখ পড়ল ফ্লাইওভারের মাঝে চিৎ হয়ে পড়ে থাকা নির্জীব দেহটার ওপর।

—"শিট!" সালেহিনের মুখ ঝুলে গেল, "তুই করেছিস কি? মানুষ মেরেছিস তুই! বলেছিলাম! আমি বলেছিলাম তোকে আস্তে চালাতে। এখন দ্যাখ। ড্যাম। শেষপর্যন্ত মানুষ খুন করলি?"

আরিফ ততক্ষণে গাড়িতে উঠে বসেছে। সালেহিনকে উদ্দেশ্য করে চিৎকার করে বলল, "গাধার মতো দাঁড়িয়ে থাকিস না, গাধা গাড়িতে ওঠ! জলদি পালাতে হবে এখান থেকে!"

সালেহিন তার কথায় কান দিল না। গাড়ির সামনের অংশ একবার দেখল। হুড দেবে ঢুকে গেছে।

—"গাড়িতে উঠবি তুই?" আরিফ গলা ফাটিয়ে চিৎকার করল। তার কপালে একটা শিরা দপদপ করছে।

সালেহিন কি মনে করে দৃঢ় পায়ে ফ্লাইওভারের মাঝে পড়ে থাকা দেহটার দিকে এগিয়ে গেল। তারপর মানুষটার পাশে এক হাঁটু গেড়ে বসে মনোযোগ দিয়ে কিছু একটা দেখল।

আরিফ গাড়ির আয়নায় এ দৃশ্য দেখে কুৎসিত একটা গালি দিয়ে বের হয়ে এলো।

—"কি করছিস তুই ওখানে? তোর কি মাথা পুরোপুরি খারাপ হয়ে গেছে?"

আরিফ দুই হাত দু'দিকে আন্দোলিত করে উত্তেজিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল।

—"আরিফ?" সালেহিন মুখ তুলে আরিফের দিকে তাকাল।

—"কি?

"আমার মনে হয় লোকটা মরে নাই।" সালেহিন আঙুল দিয়ে দেখাল।

—"মানে?" আরিফ ভ্রূ কুঁচকে সামনে এগিয়ে এলো। রক্তের একটা ধারা লোকটার দেহের চারপাশে ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়েছে। ফ্লাইওভারের সোডিয়াম ল্যাম্পের আলোয় লাল রক্ত কালচে মনে হল।

সালেহিন খুব সাবধানে ধীরে ধীরে লোকটাকে উপুড় করল। সে এক বীভৎস দৃশ্য! মাথার একাংশ দেবে ভেতরে ঢুকে গেছে। একটা হাত বিচিত্রভাবে মুচড়ে গেছে। মুখ রক্তে মাখামাখি। পরনের শার্ট-প্যান্টও রক্তে একাকার। কাপড়চোপড় দেখে আন্দাজ করা যায় লোকটা মধ্যবিত্ত পরিবারের। আরিফ চাপা স্বরে জিজ্ঞেস করল, "তুই কিভাবে জানিস লোকটা এখনোও বেঁচে আছে?"

সালেহিন লোকটার বুকের দিকে দেখাল, "এখনো নিঃশ্বাস নিচ্ছে লোকটা। ভালো করে লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারবি।"

সত্যিই তাই, খুব ধীরে ধীরে বুক ওঠানামা করছে।

—"কি করবি এখন?" আরিফ চিন্তিত স্বরে জিজ্ঞেস করল।

—"একে এভাবে ফেলে রেখে যাওয়া যাবে না। একে হাসপাতালে নিতে হবে।" সালেহিন জানাল।

আরিফ নিচের ঠোঁট একমুহূর্ত চিন্তিত ভঙ্গিতে কামড়াল। তারপর হতাশ সুরে বলল, "চল তাহলে। দু'জনে ধরে লোকটাকে গাড়িতে ওঠাই।"

দু'জনে খুব সাবধানে লোকটাকে তুলে গাড়ির পেছনের সিটে শুইয়ে দিল। লোকটার মাথা থেকে তখনও অবিরাম রক্ত ঝরে পড়ছে। সিট রক্তে মাখামাখি হয়ে গেল।

"তাড়াতাড়ি চল।" সালেহিন তাড়া দিল। "ফ্লাইওভার থেকে নেমে প্রথম যেই হাসপাতাল দেখবি সেখানেই থামাবি।"

আরিফ ইঞ্জিন স্টার্ট দিতে দিতে বলল, "ওরা যখন জিজ্ঞেস করবে কিভাবে লোকটার এমন অবস্থা হলো, তখন কি জবাব দিবি?"

"কিছু একটা বলা যাবে।" সালেহিন বিরক্ত হলো। "বলবি, লোকটাকে ফ্লাইওভারের ওপর অন্য একটা গাড়ি চাপা দিয়েছে। আমরা তাকে ফ্লাইওভারের ওপর আহত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে নিয়ে এসেছি। আর যাই হোক, যে কোনো একটা কাহিনী বানানো যাবে। এখন আর কথা না বাড়িয়ে গাড়ি চালা। এই লোকটা মনে হচ্ছে যে কোনো সময়ে মরে যেতে পারে।"

আরিফ এ কথা শুনে আর দ্বিরুক্তি না করে গাড়ি চালিয়ে চলল হাসপাতালের উদ্দেশ্যে।

ফ্লাইওভার থেকে নামতেই বড় একটা হাসপাতাল দেখতে পেল ওরা। আরিফ দ্রুত গাড়ির গতি কমিয়ে আনল। হাসপাতালের গেটে একটা গার্ড বসে ঘুমে ঢুলছে। আরিফ হঠাৎ কি মনে করে একবার পেছনে তাকাল। তারপর নিচু একটা শিস দিয়ে গাড়ি রাস্তার বাম পাশে নিয়ে থামাল।

—"কি হলো, গাড়ি থামালি কেন?" সালেহিন উত্তেজিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল।

আরিফ কোনো জবাব না দিয়ে পেছন ফিরে এক হাত বাড়িয়ে দিল লোকটার নাকের নিচে, তারপর হাত রাখল লোকটার বুকের ওপর।

—"ওর নিঃশ্বাস নেয়া বন্ধ হয়ে গেছে।"

—"কি?" সালেহিন চমকে পেছন দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল।

আরিফ ঢোঁক গিলে আড়চোখে তাকাল গেটের গার্ডের দিকে। লোকটা এখনও চোখ খুলেনি। তারপর পেছনে আরেকটু ঝুঁকে আহত লোকটার কব্জি আঙুল দিয়ে ধরল।

—"কি করছিস?" সালেহিন ক্রুদ্ধ কণ্ঠে চাপা গলায় বলল।

আরিফ কপাল কুঁচকে বিরক্তি প্রকাশ করল। সে লোকটার পালস আছে কি-না, তাই পরীক্ষা করছে। এই পদ্ধতি বায়োলজি পড়ানোর সময় তার টিচার শিখিয়েছেন।

আধ মিনিট পর গম্ভীর গলায় সে সালেহিনকে জানাল, "কোন পালস পাচ্ছি না। কোনো হার্টবিটও নেই। দমও ফেলছে না। সালেহিন, লোকটা মনে হয় মরে গেছে।"

সালেহিনের মুখ রক্তশূন্য হয়ে গেল, "শিট। কি করবি এখন!"

আরিফ গাড়ি ধীরে ধীরে ঘুরিয়ে ফেলল। ভাগ্যিস, গার্ডটা এখনও ঘুমাচ্ছে। আরেকটু হলেই তো সে হাসপাতালের ভেতর মৃতদেহ নিয়ে ঢুকে পড়তে যাচ্ছিল। ভাগ্য ভালো যে রাস্তার পাশে গাড়ি থামিয়েছিল।

সালেহিন কাতর কণ্ঠে আবারো জিজ্ঞেস করল, "কি করবি এখন? লাশ নিয়ে যাবি কোথায়? ওহ গড, তোর কারণে এখন ফাঁসিতে ঝুলতে হবে। শালা! শুধুমাত্র তোর কারণে। এখন মুখ বন্ধ করে আছিস কেন? জবাব দে! কি করবি এখন?"

—"চিৎকার করা বন্ধ কর।" আরিফ হিসহিস করে বলল। "আমাকে চিন্তা করতে দে।"

এখন রাস্তায় কোনো রাত জাগা স্টুপিড পুলিশ না থাকলেই হয়। বলা যায় না, র‍্যাবের হাতেও পড়তে পারে তারা। আজ রাতে যা যা ঘটে গেছে এরপর যে কোনো কিছু ঘটাই সম্ভব।

সালেহিন ইতস্তত করে লাশটির দিকে তাকাল। কি কুৎসিত একটা দৃশ্য। লাশের ডান চোখ অর্ধেক খোলা। চোখের মণি ঘোলাটে। বাম চোখ থেঁতলে বুজে গেছে। মুখ হাঁ করা। সালেহিনের এখনও বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে যে লোকটা মরে গেছে। এই প্রথম সামনাসামনি চাক্ষুষ মরা মানুষ দেখছে সে। হঠাৎ গা গুলিয়ে উঠল তার।

সেই মুহূর্তে আরিফ সকল সম্ভাব্য পন্থার কথা চিন্তা করছিল। গাড়ির গতি আশিতে নিয়ে এসেছে। কিছুক্ষণ চিন্তা করার পর সে সালেহিনের দিকে তাকাল। সালেহিন আড়ষ্ট হয়ে পেছন ফিরে এক দৃষ্টিতে লাশটাকে দেখছে। তার চোখে অসুস্থ দৃষ্টি।

—"সালেহিন?" আস্তে সে নিচু গলায় ডাকল।

সালেহিনের হুঁশ যেন ফিরে এলো। সামনে ফিরে ঠিক হয়ে বসল সে।

—"কি বলছিস?"

—"আমার মাথায় একটা আইডিয়া এসেছে।"

—"বল, শুনি।" সালেহিন ভাবলেশহীন কণ্ঠে বলল।

—"এখন বাজে রাত একটা। হাতে এখনো অনেক সময় আছে। চল, লাশটা ঢাকার বাইরে হাইওয়েতে কোথাও ফেলে দিয়ে আসি।"

—"ফেলে দিয়ে আসবি?"

—"নয়তো কি? আরিফ নাক টেনে বলল, "বাড়ি নিয়ে যাবি লাশটা? লাশের কথা তো বাদই দিলাম, কাল এই রক্তমাখা সিট আর হুডের ড্যামেজ নিয়ে যে কি কাণ্ড হবে তা ভেবে দেখেছিস?"

—"তোর গাড়ি।" সালেহিন কাঁধ ঝাকাল।

আরিফ সালেহিনের দিকে মুখ শক্ত করে তাকাল, "দ্যাখ শালা, ওকথা বলে পার পেয়ে যেতে পারবি না। আমি ধরা খেলে তুইও খাবি। এখন ঠিক করে বল, আমার প্ল্যানটা কি রকম মনে হচ্ছে?"

—"তোর যা ইচ্ছা হয় কর।" সালেহিন নিরুত্তাপ কণ্ঠে বলল।

আরিফ গাড়ি ঘুরিয়ে ফেলল। সোনারগাঁ পার হয়ে রাস্তায় লাশটা কোথাও ফেলে দিতে পারলেই হয়। যে কেউ লাশটা পেলে ভাববে হাইওয়েতেই অ্যাক্সিডেন্টটা ঘটেছে। শীতকালে কুয়াশার জন্য কত দুর্ঘটনাই তো ঘটে। আর সালেহিনটা এমন খচ্চর– কোনো সাপোর্ট দিচ্ছে না এখন।

রাস্তাঘাট ফাঁকা থাকায় আধঘণ্টায় তারা ডেমরার কাছে চলে এলো। রাস্তার পাশে ইতস্তত ট্রাক থেমে আছে। এত রাতেও কুয়াশার চাদর খুব একটা ভালো করে জেঁকে বসেনি– সবকিছু এখনও বেশ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে।

আরিফ গতি বাড়িয়ে দিল। মিনিট বিশেকের মধ্যে তারা কাঁচপুর ব্রিজ পার হয়ে সোনারগাঁর পথে রওনা হলো।

কিছুদূর যাবার পর আচমকা আরিফ রাস্তার পাশে গাড়ি দাঁড় করাল। সালেহিনের একটু তন্দ্রামতো এসে গিয়েছিল। সে ধড়ফড় করে সোজা হয়ে বসল।

—"কি হলো, থামালি কেন?"

—"জোর বাথরুম চেপেছে।" আরিফ জবাব দিল। "তুইও আসবি নাকি?"

—"না।" সালেহিন মাথা নাড়ল। "তাড়াতাড়ি কাজ সেরে ফিরে আয়।"

আরিফ গাড়ি থেকে একটু দূরে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে যেতেই সালেহিন সিটে মাথা এলিয়ে দিল। চারদিকে অস্বাভাবিক নিস্তব্ধতা। শোঁ করে দ্রুতবেগে তাদের পাশ দিয়ে একটা বাস ঢাকার দিকে চলে গেল। দূরে কোথাও একটা কুকুর থেমে থেমে ডাকছে।

আরিফ কাজ সেরে ফিরে এসে গাড়ির ইঞ্জিন স্টার্ট করল।

—"ঠিক আছিস?" সালেহিনকে উদ্দেশ্যে করে প্রশ্ন ছুড়ে দিল সে।

সালেহিনের কেন জানি বেশ কিছুক্ষণ থেকে ঠাণ্ডা লাগছে। প্রতি মিনিটে ঠাণ্ডা যেন বেড়েই চলেছে। দু'হাতের তালু ঘষতে ঘষতে সে নিচু গলায় জিজ্ঞেস করল, "হিটারটা ঠিকমতো কাজ করছে তো? বড্ড ঠাণ্ডা লাগছে।"

—"হিটার ঠিকই আছে।" আরিফ এক নজর দেখে বলল, "এবার ঠাণ্ডা আসলে খুব বেশিই পড়েছে।"

সালেহিন পকেট থেকে সিগারেট বের করে ধরাল। ঠাণ্ডা আগের চেয়ে বেশি লাগছে। আড়চোখে একবার লাশটার দিকে তাকাল। অদ্ভুত একটা ব্যাপার ওর নজরে এলো। একটু আগে লাশটার এক হাত সিটের বাইরে ঝুলছিল– এখন তা বুকের ওপর রাখা।

গড়ির ঝাঁকুনিতেই হয়তো হাতটা সরে গেছে, নিজেকে বোঝাল কিন্তু তারপরও মনের ভেতর খচখচ করতে লাগল। একটু উশখুশ করে আরিফকে জিজ্ঞেস করল, "তুই নিশ্চিত লোকটা মরে গেছে?"

আরিফ ভ্রূ কুঁচকালো। "কোনো হার্টবিট নাই, পালস নাই, দম ফেলছে না– এর চেয়ে বেশি নিশ্চিত হবার আর কোনো উপায় নেই। কিন্তু হঠাৎ এ কথা জিজ্ঞেস করছিস কেন?"

সালেহিন আমতা আমতা করে কথাটা এড়িয়ে গেল, "না, কিছু না। এমনিতেই।"

খুট করে পেছনে একটা শব্দ হলো। সালেহিন চমকে সাথে সাথে পেছনে তাকাল। নাহ্, লাশটা আগের মতোই আছে। আরিফ সালেহিনের হাবভাব লক্ষ্য করে বিরক্তির সাথে বলল, "তোর হয়েছেটা কি? ভয় পাচ্ছিস নাকি?"

—"না, মানে...কি যেন শব্দ হলো না পেছনে?"

—"চাকা থেকে ইটের কুচি ছুটে এসে গাড়ির বডিতে লেগেছে হয়তো। রাস্তার অবস্থা দেখছিস না, ইটের টুকরোয় ভরা।" আরিফ বোঝাল।

—"তাই হবে।" সালেহিন সায় দিল। পরমুহূর্তেই আবার কি মনে করে পেছন ফিরল। যা দেখল, তা তার দেহকে আতঙ্কে অসার করে দিল।

লাশটার অর্ধখোলা ডান চোখ নিষ্পলক চেয়েছিল গাড়ির ছাদের দিকে। এখন সেই চোখের মণি ঘোরানো সালেহিনের দিকে– ভয়াবহ সে দৃষ্টি! লাশটার হাঁ হয়ে থাকা মুখের দু'প্রান্ত ঠেলে উপরে উঠে এসেছে; ঠোঁট বাঁকানো– লাশটা হাসছে।

সালেহিনের হাত থেকে জ্বলন্ত সিগারেট পায়ের কাছে পড়ে গেল। আরিফ তা দেখে খেঁকিয়ে উঠল, "ম্যাট পুড়িয়ে ফেলবি তো স্টুপিড। সিগারেট নিচে ফেললি কেন? কি হয়েছে তোর? কি দেখছিস?"

বলে সেও পেছন ফিরল। নিজের অজান্তেই মুখ থেকে কাতর একটা আর্তনাদ বেরিয়ে এলো। লাশটা উঠে বসেছে।

আরিফের আর্তনাদই সালেহিনের হুঁশ ফিরিয়ে আনে। বিন্দুমাত্র কালক্ষেপণ না করে, সিটবেল্ট একটানে খুলে ফেলে চলন্ত গাড়ি থেকে সে বাইরে ছিটকে পড়ল। রাস্তার পিচঢালা অংশে মাথায় প্রচণ্ড আঘাত পেয়ে সাথে সাথে জ্ঞান হারাল সালেহিন।

গাড়ির স্পিড বিপজ্জনকভাবে বেড়ে চলেছে। যে কোনো মুহূর্তে রাস্তা বাঁক নিতে পারে, কিন্তু আরিফের গাড়ির ওপর কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। সে একদৃষ্টিতে চেয়ে আছে মৃতদেহটির দিকে। তার পা আপনা থেকেই এক্সেলেটরে চাপ বাড়িয়ে দিচ্ছে।

লাশটা রক্তমাখা হাত বাড়িয়ে আরিফের মুখ জড়িয়ে ধরল। গাড়িটা রাস্তার পাশে বড় একটা গাছের সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়ে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাবার ঠিক আগে আরিফ একটা গন্ধ পেল– তাজা রক্তের গন্ধ। রক্তে ভেজা চটচটে হাত তার দম বন্ধ করে দিচ্ছে। তারপরই বিকট এক শব্দের সাথে পৃথিবীর আলো তার চোখের সামনে থেকে পাকাপাকিভাবে নিভে গেল।

কুয়াশার জন্য কিছুই দেখা যাচ্ছে না। হাবিব টেম্পোর স্টিয়ারিংয়ে শক্ত একটা চাপড় মেরে মৃদু গালাগাল দিল। টেম্পোর যাত্রী বলতে কেবল একজন– তারই গ্রামের ইদ্রিস। তাকেও মনে মনে একচোট গালিগালাজ করল হাবিব। ঢাকায় যাবার আর সময় পেল না গাঁইয়াটা। সাধারণত এত রাতে টেম্পো বের করে না হাবিব, কিন্তু গাধাটার জন্য বের করতে হয়েছে। ঢাকায় তার কোনো আত্মীয় অসুস্থ। এখনি নাকি যেতে হবে।

নিজের গ্রামের লোক বলে টেম্পো ভাড়াও হাবিব পুরোটা পাবে না। অন্য সময় তার টেম্পো লোকে ভরা থাকে, কিন্তু এত রাতে সে যাত্রী পাবে কোথায়? তাই এই মুহূর্তে টেম্পোতে সে আর পেছনের সিটে বসা ইদ্রিস ছাড়া আর কেউই নেই।

এখন আর কোনো প্যাসেঞ্জার পেলেই হয়। তাহলে তার লোকসান কিছুটা হলেও কমানো যাবে। ভারী কুয়াশা বলে বেশ আস্তেই চালাচ্ছে হাবিব। হঠাৎ টেম্পোর হেডলাইটের আলোয় সে রাস্তার পাশে হাত বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটাকে দেখতে পেল।

ঘ্যাঁচ করে টেম্পো লোকটার পাশে থামাল। কুয়াশা এখন এতই ভারী হয়েছে যে লোকটার চেহারা, অবয়ব, কিছুই স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে না। তার ওপর বাজে তিনটা। ঘুটঘুটে অন্ধকার।

—"ঢাকায় যাবেন নাকি ভাই?" হাবিব আগ্রহের সাথে জিজ্ঞেস করল।

লোকটি ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল।

—"পেছনে উঠে পড়েন ভাই।" হাবিব পেছন থেকে ইঙ্গিত করে ইঞ্জিন চালু করল।

ইদ্রিস সিটের ওপর বসে ঢুলছিল। নতুন যাত্রীর আগমনে ঘুম টুটে গেল। টেম্পোর পেছনে আলো বলতে কেবলমাত্র একটা হারিকেন। তেল কম আর সলতে নামানো বলে আলোর চেয়ে সেটা ছায়াই বেশি দিচ্ছিল।

—"ঢাকায় যাচ্ছেন নাকি ভাই?" হাবিবের প্রশ্ন ইদ্রিস পুনরাবৃত্তি করল আলাপ জমাবার আশায়।

লোকটা কোনো জবাব না দেয়ায় ইদ্রিস আরো ভালো করে তাকাল তার দিকে। আঁতকে উঠল সে।

—"এ-কি ভাই! আপনি দেখছি মারাত্মক আহত। কি হয়েছিল?" ইদ্রিস সিট ছেড়ে অর্ধেক উঠে জিজ্ঞেস করল।

সত্যিই লোকটা গুরুতরভাবে আহত। সর্বাঙ্গে রক্ত মাখা। ইদ্রিস লোকটার কাঁধে হাত রাখতে যাবে তখনি লোকটা মুখ তুলে তার দিকে ফিরে তাকাল।

ইদ্রিস অস্ফুট একটা আর্তনাদ করে তার সিটে ছিটকে ফিরে গেল। মনে মনে দ্রুত আয়াতুল কুরসি পড়া শুরু করল। টেম্পোতে ঢোকার পথের দিকে হেঁচড়ে নিয়ে গেল নিজেকে। বেকুব হাবিবটা না বুঝে কি উঠতে দিয়েছে টেম্পোতে? ইদ্রিস একটানা দোয়া-দরুদ পড়তে পড়তে ঠিক করল– প্রেতটা কিছু করলেই বাছ-বিচার না করে টেম্পো থেকে বাইরে লাফ দিয়ে পালাবে। বজ্জাত হাবিবটা কি ওঠাল না দেখে?

হঠাৎ ইদ্রিস অনুভব করল তার বেজায় তেষ্টা পেয়েছে। আর পায়ের কাছে সামান্য ভেজা ভেজাও লাগছে। কাপড় নষ্ট করে ফেলল নাকি? ফেললে ফেলুক, আগে জানে তো বাঁচতে হবে।

রাতের আঁধার ভেদ করে টেম্পোটা ছুটে চলল ঢাকার উদ্দেশ্যে। ভেতরে হাবিব, ইদ্রিস আর... সেই লোকটা।

নেকড়ে

—"বাবু! বাবু!" দরজায় ক্রমাগত ধাক্কার শব্দে ঘুমটা টুটে গেল। এখন বাজে কয়টা? কাল রাত তিনটা পর্যন্ত জেগে ছিলাম। নানা লেখালেখির কাজ বাকি ছিল। তাই শেষ করছিলাম। ভেবেছিলাম বেশ দেরি করেই ঘুমাব, কিন্তু প্রফুল্লটার জ্বালায় তা বোধহয় আর সম্ভব হয়ে উঠবে না।

আড়মোড়া ভেঙে লম্বা একটা হাই তুলে বিছানা ছাড়লাম। ঘড়ি দেখেই মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। কেবল নয়টা বাজে। এত সকালে আমাকে জাগানোর মানেটা কি?

—"বাবু! ঘুম থেকে উঠুন।" এবার প্রফুল্ল দরজায় আঘাত করতে করতে ডাকতে লাগল।

দরজা এক ঝটকায় খুলে চোখ লাল করে কড়া এক ধমক দিলাম, "কি হয়েছে? এত সকালে চিল্লাছিস কেন?"

প্রফুল্ল কাচুমাচু হয়ে জবাব দিল, "রাগ করবেন না বাবু। সজীববাবু অনেকক্ষণ থেকে নিচে আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন।"

তখনি আমার টনক নড়ল। এই রে! সজীব গত পরশুদিন বলেছিল, শুক্রবার সকালে সে আসবে। কি যেন জরুরি কথা আছে। গায়ে দ্রুত পাঞ্জাবি গলিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "ওকে নাস্তা দিয়েছিস তো?"

—"জি বাবু।"

—"ওকে আরেকটু অপেক্ষা করতে বল। আমি আর একটু পরেই নিচে নামছি। আমার নাস্তা বৈঠকখানাতেই দিয়ে দে। মনে আছে তো, কি বলেছিলাম গতকাল? কেবল একটা টোস্ট আর এক কাপ চা।"

—"জি বাবু, মনে আছে।" প্রফুল্ল একগাল হেসে নিচে নেমে গেল।

দ্রুত হাত মুখ ধুয়ে ফেললাম। জানালা দিয়ে নিচে তাকাতেই বাগানের ফুলগুলো চোখে পড়ল। অবসর নেবার পর ঢাকা ছেড়ে এ জায়গায় সেট্‌ল করার পর

পরই বাগানে হাত লাগিয়েছি। একসময়ের জংলা জায়গাটুকু অনেক যত্নের সাথে ধীরে ধীরে রূপান্তরিত করতে হয়েছে।

সজীব আমার ছেলেবেলার বন্ধু। আমার মতো সেও শেষ বয়সে রিটায়ার করে গ্রামে ফিরে এসেছে। পৈতৃক পোড়োবাড়িটা মনের মতো করে সাজাতে সেও বেশ সাহায্য করেছে। তার আবার অনেক বাতিক রয়েছে– তার মধ্যে একটা হলো পুরনো কাগজপত্র, পুঁথি ইত্যাদি জোগাড় করে জমানো। এখানে এসেও নানা জায়গায় ঘুরে বেড়িয়েছে পুরনো দলিলপত্রের খোঁজে। বাড়ি সাফ করার সময় যেসব পুরনো খাতাপত্র পেয়েছিলাম, তা সবই তাকে দিয়ে দিয়েছি। জঞ্জালগুলো আমি এমনিতেই ফেলে দিতাম। সে যদি সেগুলো রাখতে চায়, রাখুক না।

নিচে বৈঠকখানায় নেমে দেখি সজীব একাগ্রচিত্তে ওমলেট খাচ্ছে আর আজকের পত্রিকার পাতা ওল্টাচ্ছে। আমার পায়ের শব্দে চোখ তুলে তাকাল।

—"এত দেরি করে ঘুমাচ্ছিলি যে? আমি তো সেই তখন থেকে তোর জন্য অপেক্ষা করছি।"

—"আসলে গতকাল অনেক রাত পর্যন্ত জেগে ছিলাম।"

—"কি করছিলি?"

—"আর বলিস না, কাজের কি কোনো শেষ আছে নাকি? কিছু অসমাপ্ত লেখা পড়ে ছিল। সেগুলো শেষ করলাম", সোফায় বসে জবাব দিলাম।

—"তবুও।" সজীব পত্রিকাটা ভাঁজ করে পাশে রাখল, "আমাদের এই বয়সে এত রাত পর্যন্ত জাগাটা উচিত নয়। আমাকে দ্যাখ না, দশটায় শুয়ে পড়ি, উঠি ভোর ছ'টায়। আর্লি টু বেড, আর্লি টু রাইজ– মেক্‌স এ ম্যান হেলদি ওয়েলদি এন্ড ওয়াইজ, পড়িসনি?"

—"ধুৎ, তুই যে কি বাজে কথা বলিস।"

প্রফুল্ল এসে টোস্ট আর চা রেখে গেল। সজীব তা দেখে মন্তব্য করল, "তাও ভালো যে সঙ্গতভাবে খাওয়া-দাওয়া চালাচ্ছিস।"

আমি জবাব না দিয়ে কাঁধ ঝাঁকালাম। টোস্ট দ্রুত শেষ করে গরম চা'তে তাড়িয়ে তাড়িয়ে চুমুক দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "সেদিন যখন তোর সাথে দেখা, তখন তুই বেশ উত্তেজিত ছিলি। বলেছিলি আজকে কি একটা জিনিস আমাকে দেখাবি। কি ব্যাপার?"

সজীব সোফায় তার পাশে রাখা কালো একটা ব্যাগ থেকে একতাড়া কাগজ বের করে আমার দিকে বাড়িয়ে দিল।

—"এটা কি?" কাগজগুলো হাতে নিয়ে প্রশ্ন করলাম। তারপর প্রফুল্লকে ডাক দিলাম, "প্রফুল্ল, যা তো। ওপর থেকে আমার চশমা নিয়ে আয়। টেবিলের উপর রাখা আছে।"

কাগজগুলোর ওপর একনজর চোখ বোলালাম। যদিও লেখাগুলো পড়া যাচ্ছিল না, কিন্তু কাগজগুলো মনে হলো বেশ পুরনো। সাদা কাগজের নানা জায়গায় হলুদের ছোপ দেখা যাচ্ছে। পুরনো জমা ধুলোর গন্ধ নাকে ধাক্কা দিল।

—"কি এটা?" আবারও জিজ্ঞেস করলাম।

—"বেশ ইন্টারেস্টিং কিছু ব্যাপার লেখা গেছে ওটাতে। ডায়রিও বলতে পারিস।" সজীব জানাল।

—"ডায়রি? কার?"

সজীবের হাবভাব দেখে আমার প্রথম থেকেই সন্দেহ হচ্ছিল কাগজগুলোর ব্যাপারে সব খুলে বলার জন্য উত্তেজনায় তার পেট ফেলে যাচ্ছে। আমার সন্দেহ অমূলক প্রমাণ করে সে হড়বড় করে বলে উঠল, "লেখাগুলো আমাদের এখানকার চার্চের ফাদার সুনীল পিউরিফিকেশনের। খুব সম্ভবত বছর বিশের আগে লেখা।"

—"দাঁড়া", আমি বাধা দিলাম। প্রফুল্লর হাত থেকে চশমা নিয়ে চোখে পড়ে সজীবের দিকে কপাল কুঁচকে তাকালাম, "কোন ফাদার সুনীল? আমার জানামতে গাঁয়ের চার্চের ফাদার একজনই, তাঁর নাম রোজারিও গোমেজ।"

সজীব মাথা নাড়ল, "উনি তো মাত্র ছ'বছর এখানে আছেন। তাঁর আরও অনেক আগে যিনি ফাদার ছিলেন, তাঁরই নাম সুনীল পিউরিফিকেশন। আমি সব খোঁজখবর নিয়েই এসেছি।"

—"তা তুই এসব কাগজপত্র পেলি কোথায়?"

সজীব খুলে বলল, "তুই তো জানিসই আমার সংগ্রহের কথা। সেদিন জানতে পারলাম চার্চ পুরোদমে পরিষ্কার করা হচ্ছে। অনেক পুরনো অদরকারি বাতিল জিনিসপত্র ফেরে দেয়া হবে। শুনেই ছুটে গেলাম সেখানে। ফেলে দেয়া পুরনো কাগজপত্রের মধ্যেই লেখাটা পেলাম।"

—"তো, কি এমন ইন্টারেস্টিং জিনিস লেখা আছে ডায়রিতে?"

সজীব হাত দোলাল, "তার আগে তুই আমাকে একটা কথা বল– তুই কি অতি প্রাকৃতিক ব্যাপার-স্যাপারে বিশ্বাস রাখিস?"

—"মানে ভূত-প্রেত? আমি ওসব বিশ্বাস করি না।" চা এক চুমুকে শেষ করে জবাব দিলাম।

সজীব অসহিষ্ণু ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল, "আমি তা বলছি না। আমি বলছি প্রকৃতিতে অনেক সময় অনেক ঘটনাই ঘটে, যার কোনো ব্যাখ্যা নেই। তুই কি সেসব বিশ্বাস করিস?"

—"হ্যাঁ, তা বলতে পারিস। কারণ সত্যিই এ পৃথিবীতে অনেক কিছুই আছে যার ব্যাখ্যা বিজ্ঞান এখনো দিতে পারেনি। কেন, এ কাগজে কি সেরকম কিছু লেখা আছে নাকি?"

—"সেটা তুই পড়েই দেখ। তুই পড়তে থাক আর আমি এই সুযোগে প্রফুল্লকে বলি আরেকটা ওমলেট পাঠাতে।"

আমি আড়চোখে সজীবের দিকে শ্যেন দৃষ্টি হেনে কাগজগুলোর দিকে মনোযোগ ফেরালাম। সজীবটা একটুও বদলায়নি। একটু আগেই আমাকে এ বয়সে নিয়ম মেনে চলা নিয়ে নানা উপদেশ দিচ্ছিল, অথচ সে নিজেই সমানে খেয়ে চলেছে।

"ফাদার সুনীল পিউরিফিকেশনের ডায়রি"

১৯৭?

এই লেখা কখন, কার হাতে পাড়বে, সে ব্যাপারে আমার কোনো ধারণা নেই। তবুও সবিনয়ে জানাচ্ছি– যা লিখেছি এখানে, তার এক বর্ণও মিথ্যা নয়। এটা পড়ার পর অনেকেই ভাবতে পারেন যে আমার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছে। কিন্তু আমি হলফ করে বলছি– নিম্নে যা যা বর্ণিত তার সবই সত্যিই ঘটেছিল।

সে বছর আমি বাংলাদেশে ছিলাম। আগেই বলে নেয়া ভালো অন্যদের সম্মানের কথা চিন্তা করে কিছু কিছু তথ্য গোপন করতে বাধ্য হচ্ছি। যাই হোক, ছিলাম মিয়ানমার এবং বাংলাদেশের সীমান্তের কাছে একটি গ্রামে। ধরা যাক সে গ্রামের নাম ধারাগোল (ছদ্মনাম চিন্তা করতেই কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের একটা গল্পের কথা মনে পড়ে গেল। সেখান থেকেই আমি নামটা ব্যবহার করছি)।

যাই হোক, ধারাগোল গ্রামটা মিয়ানমারের সীমান্তের খুবই কাছে। ক'বছর আগে ঘটে যাওয়া স্বাধীনতা যুদ্ধের পর বাংলাদেশ তখন ধীরে ধীরে মাথা উঁচু করে জেগে উঠছে। শুকিয়ে যাচ্ছে যুদ্ধের ক্ষত, কিন্তু ধারাগোল গ্রাম আগে যেমন ছিল, তেমনি রয়ে গিয়েছে। সভ্যতা থেকে দূরে প্রাচীন একটি গ্রাম।

এখানে আসার পর প্রথম প্রথম উপজাতিরা আমাকে খুবই সন্দেহের চোখে দেখত। তবে এই ছ'মাসের মধ্যেই ওরা আমাকে বিশ্বাস করা শুরু করছে। WHO-তে কাজ করার ফলে অসুখ-বিসুখের ব্যাপারে ভালোই জ্ঞান হয়েছিল আমার। সেই জ্ঞান ব্যবহার করে, ছোটখাটো রোগবালাই দূর করে ধীরে ধীরে ওদের আস্থা অর্জন করতে সক্ষম হই।

তবে প্রথম প্রথম সবচেয়ে বেশি অসুবিধা হয়েছিল ভাষা নিয়ে। ভাগ্য ভালো গাঁয়ে এক যুবক ছিল যে কিছুটা হলেও বাংলা জানত। সে এখন আমার দোভাষী হিসেবে কাজ করছে। তার কাছ থেকেই ওদের স্থানীয় ভাষা অল্প অল্প করে শিখে নিচ্ছি। আমার এখানে আসার অবশ্য আরও একটা উদ্দেশ্য আছে– এদেরকে আলোর পথ দেখানো। এই উপজাতিরা যে কত অসংখ্য দেব-দেবীতে বিশ্বাস করে, তার কোনো ঠিক নেই। ওদেরকে ঈশ্বরের বার্তা পৌঁছে দেয়া আমার অবশ্যকর্তব্য।

আমার প্রথম সাফল্য আমার দোভাষী যুবক বন্ধু– সিন্‌মা হ। বিচিত্র নাম। খুবই মনোযোগী, নিষ্ঠাবান ছেলে। ওকে বাংলা অক্ষরজ্ঞান শেখাচ্ছি। বাইবেল থেকে যখন পড়ে শোনাই, একাগ্রচিত্তে শোনে সে। ওকে ছাড়া আমার কোনো কাজই হয়ে ওঠে না। যখনি কোথাও ডাক পড়ে, আমার ওষুধের ব্যাগ কাঁধে বয়ে পিছু পিছু আসে সে।

বেশ ভালোই যাচ্ছিল দিনগুলো। তারপর, হঠাৎ একদিন সিনমা এসে অদ্ভুত কিছু খবর দিল। ক'দিন ধরেই গাঁয়ের খোঁয়াড়ে, গোয়ালে কোনো জন্তু ঢুকে হাঁস-মুরগি ইত্যাদি ধরে নিয়ে যাচ্ছে। একটা গরুও মারা পড়েছে জন্তুটার কারণে। এই ঘটনাটা ঘটেছে গত রাত্রে। গাঁয়ের কৃষক মান জং গভীর রাতে গোয়ালে গরুর গোঙানোর শব্দ শুনে ছুটে যায়। চাঁদের আলোয় সে দেখতে পায়– গোয়ালের ভেতর তার গরু মাটিতে পড়ে ছট্‌ফট্‌ করছে। গরুটার গলা কামড়ে ধরে আছে বড়সড় চারপেয়ে একটা জন্তু।

জন্তুটা বাঘ না নেকড়ে তা ঠিক বোঝা যায়নি। সেটাকে দেখেই মান জং গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে ওঠে। তার চিৎকার শুনে লোকজন ছুটে এলে জন্তুটা দ্রুত পালিয়ে যায়।

সেদিন বিকেলেই গাঁয়ের সবাই বসে ঠিক করল, যেভাবেই হোক জন্তুটাকে ধরতে হবে। যেই ভাবা সেই কাজ। জন্তুটার পায়ের ছাপ যেসব খোঁয়াড় আর গোয়ালের আশেপাশে দেখা গেছে সেসব জায়গায় ফাঁদ পাতা হলো। সিনমা কিছুক্ষণ পরপর এসে জানাচ্ছিল কোথায় কি হচ্ছে।

সে রাতেই বারোটা কি একটা নাগাদ জন্তুটা ধরা পড়ল। তখন আমি সবেমাত্র মোমবাতি নিভিয়ে শুতে যাবার প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। এমন সময় সিনমা হন্তদন্ত হয়ে এসে জানাল জন্তুটার ফাঁদে ধরা পড়ার কথা। গায়ে দ্রুত একটা চাদর চাপিয়ে রওনা দিলাম। পথে সিনমা ঘটনাটা খুলে বলল– মিনা ম্রু'র গোয়ালের কাছে পাতা ফাঁদে জন্তুটা ধরা পড়েছে। এখন ওটাকে গলায় মোটা দড়ি বেঁধে আটকে রাখা আছে।

সে রাতে আকাশে বিশাল পূর্ণিমার চাঁদ ছিল। চারদিক যেন রুপোয় মোড়ানো। এত আলো, মনে হাচ্ছিল মাটিতে একটা পিন ফেললেও সেটা খুঁজে বের করা যাবে। মিনা ম্রু'র ভিটায় পৌঁছে দেখি জন্তুটা আর কিছুই না– বড়সড় একটা নেকড়ে। গাছের সাথে বাঁধা। কেউ সেটার কাছে গেলেই তেড়ে আসছিল নেকড়েটা।

আমি অতি সন্তর্পণে একটু কাছে এগিয়ে ভালোভাবে নেকড়েটাকে পর্যবেক্ষণ করলাম। ধূসর লোমে ঢাকা শরীর, ঘনঘন দাঁড়িয়ে টান দিচ্ছে দড়ি ছিঁড়ে ফেলার আশায়। চাপা গোঁ গোঁ শব্দও করছে মাঝে মাঝে। আর কি ক্রুদ্ধ সেটার চোখের দৃষ্টি! যেন নাগালের ভেতর কাউকে পেলেই কামড়ে টুঁটি ছিঁড়ে ফেলবে। এক উপজাতি বাচ্চা ছেলে সাহস করে বাঁশের আগা বাড়িয়ে গুঁতো দিতে গিয়েছিল– নেকড়েটা সাথে সাথে দাঁত বের করে এমনভাবে ধেয়ে এলো যে আমরা সভয়ে

পিছিয়ে যেতে বাধ্য হই। অবশ্য গলার দড়িতে জোরে টান পড়ায় নেকড়েটা পিছু হটে যেতে বাধ্য হয়।

গাঁয়ের মাথা তখনই তার সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিল যে আগামীকাল ভোরে সূর্যোদয়ের সময় নেকড়েটাকে হত্যা করে সেটার মাংস সবার মাঝখানে বিলি করা হবে।

আগেই বলেছি, সেদিন পূর্ণিমার রাত ছিল। আমরা সবাই একাগ্রচিত্তে নেকড়েটার কাণ্ডকারখানা দেখছিলাম। এক সময় আমার মনে হলো, নেকড়েটা যেন একটু অদ্ভুত আচরণ করছে। সে এতক্ষণ গাছের চারপাশে বৃত্তাকারে ঘুরছিল। হঠাৎ সেটা গাছের গায়ে হেলান দিয়ে বসে গেল। তারপর আচমকা সোজা নিচের দু'পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে আকাশপানে মাথা তুলে লম্বা একটা ডাক ছাড়ল। সেই ডাক চারপাশের পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হলো।

চাঁদের আলোয় চারপাশ ঝকমক করছিল। কিন্তু সহসা আমাদের চারপাশে একটা কালো চাদর নেমে এলো। আকাশের দিকে চেয়ে দেখি পূর্ণিমার চাঁদ ঘন কালো মেঘের আড়ালে ধীরে ধীরে হারিয়ে যাচ্ছে। সাথে সাথে চারদিকের পরিবেশও থমথমে হয়ে উঠল। এতক্ষণ দক্ষিণা বাতাস বয়ে যাচ্ছিল, সেটাও থেমে গেল। চারদিকে নেমে এলো পিনপতন নিস্তব্ধতা। রাতজাগা কোনো পাখির ডাকও শোনা যাচ্ছিল না।

এরপর যা দেখলাম তা আমি কখনোই ভুলব না। চাঁদটা পুরোপুরি মেঘের আড়ালে হারিয়ে যেতেই নেকড়েটা দু'পায়ে দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থাতে মারাত্মকভাবে থরথর করে কাঁপতে শুরু করল। সাথে সাথে বিচিত্রভাবে সেটার পাগুলো মুচড়ে আকৃতি পরিবর্তন করা শুরু করল। হাড়ে হাড় আঘাত করার শব্দ প্রচণ্ডভাবে আমাদের কানে এসে বাজল। মুহূর্তের মধ্যে নেকড়েটার দেহের লোম ঝরে পড়ল; দেহের চামড়ার নিচে ঢেউ খেলে যাচ্ছে। নিমিষে লেজটা মিলিয়ে গেল দেহের পেছনের অংশে, উপরের পা পরিণত হলো মানুষের হাতে। নিচের পদযুগল রূপান্তরিত হলো মানুষের পা-এ।

তারপরই নেকড়েটা কাতর আর্তনাদ করে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল। ক্রমাগত লালা ঝরছে সেটার মুখ থেকে। মুখে যন্ত্রণার ছাপ স্পষ্ট। কটকট শব্দ করে সেটার মুখের হাড় চামড়ার নিচে স্থান পরিবর্তন করল। আমাদের চোখের সামনে নেকড়েটার লম্বা মুখ ভেতরে ঢুকে গেল, কান দুটো নেমে এলো মাথার পাশে। পশুর নাক রূপান্তরিত হলো মানুষের নাকে! বিকট একটা চিৎকার করে সেই আধা-মানুষ আধা-জানোয়ার আমাদের সামনে মাটিতে আছড়ে পড়ল। আমরা আঁতকে পিছিয়ে গেলাম। প্রবল ধাক্কাধাক্কির মাঝে গাঁয়ের মেয়েরা চিৎকার-চেঁচামেচি শুরু করে দিল।

গাঁয়ের মাথা সাহস সঞ্চয় করে মশাল হাতে সাবধানে সামনে এক পা এগিয়ে গেল। মশালের আলোয় দেখতে পেলাম নেকড়ে নয়, এখন আমাদের পায়ের কাছে

পড়ে আছে জলজ্যান্ত একটা মানুষ। সম্পূর্ণ উদোম শরীর। ঘামে ভিজে চকচক করছে সারা দেহ। চেহারা দেখে আন্দাজ করা যায়, মানুষটার বয়স পঁচিশ থেকে ত্রিশের কোঠায়। মুখে দাড়ি-গোঁফের জঙ্গল, চুল অবিন্যস্ত। গায়ের চামড়া ধুলো-ময়লায় বিবর্ণ হয়ে গেছে।

লোকটা মুখ তুলে আমাদের দিকে তাকাল। তার চোখের চাহনিতে আমি তখনো নেকড়েটাকে খুঁজে পাচ্ছিলাম। গাঁয়ের মাথার হাতে ধরা জ্বলন্ত মশালটা তার নজরে আসার সাথে সাথে জান্তব একটা শব্দ করে মানুষটা পেছনে সরে গেল। গলায় বাঁধা মোটা দড়িটা দু'হাতে খামচে ধরে এবড়ো-খেবড়ো ভাঙা দাঁত দিয়ে কাটতে চেষ্টা করল।

আমি সামনে এগোতে চাচ্ছিলাম, সিনমা আমার হাত শক্ত করে চেপে ধরল। নিচু গলায় জানাল, "সামনে যাবেন না ফাদার, ওটা অপদেবতা, অশুভ, ভয়ঙ্কর। এই অবদেবতার স্পর্শে অন্যরাও অভিশপ্ত হয়ে যাবে। ওটাকে ছোঁবেন না ফাদার!"

এবার আমি নিজেও খানিকটা উত্তেজিত হয়ে গেলাম। বিরক্ত কণ্ঠে ধমক দিলাম, "কি সব যা তা বকছ? চোখের সামনে দেখা যাচ্ছে জলজ্যান্ত একটা মানুষ। আর তুমি বলছ অপদেবতা? সরে যাও আমার পথ থেকে, লোকটাকে সাহায্য করতে হবে।"

কিন্তু এরই মধ্যে অন্যদের মধ্যেও কথাটা ছড়িয়ে পড়েছে। ওদের নিজস্ব ভাষায় 'অপদেবতা', 'শয়তান'– ইত্যাদি শব্দ আমার কানে এলো। সবাইকে অগ্রাহ্য করে আমি উঁচু গলায় লোকটাকে উদ্দেশ্য করে প্রশ্ন ছুড়ে দিলাম, "তুমি কি ঠিক আছ? কে তুমি? কি তোমার নাম, কোথা থেকে এসেছ?"

আমার গলার আওয়াজ শুনে লোকটা প্রত্যুত্তরে গোঙানোর মতো আওয়াজ করল। তারপর আবার মনোযোগ ফেরাল দড়ি কামড়াবার দিকে। লোকটার চোখের দিকে আবার তাকালাম আমি; কিন্তু না, মনুষ্যত্বের কোনো ছাপ নেই সেখানে।

গাঁয়ের মাথা কোথায় যেন গিয়েছিল। এবার ভিড় ঠেলে সামনে এগিয়ে এলো। হাতে লম্বা একটা বর্শা। তার পেছনে জনা দশেক ছেলে-ছোকরা। ওদের হাতেও বল্লম আর বর্শা ধরা। বুঝতে পারলাম চোখের সামনে নৃশংস একটা ঘটনা ঘটতে চলেছে।

গাঁয়ের মাথা বর্শা ওপরে তুলে চিৎকার করে কি যেন বলল। সিনমা উত্তেজিত কণ্ঠে অনুবাদ করে দিল, এই অপদেবতাকে এখনি হত্যা করা হবে গাঁয়ের লোকজনকে অভিশাপের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য।

আমি গাঁয়ের মাথাকে রুখতে এগিয়ে যাব, সিনমা আমাকে জাপটে ধরল। ঠিক তখনই মেঘের আড়াল থেকে চাঁদ বের হয়ে এলো। চাঁদের আলোর বন্যা চারদিকে ছড়িয়ে পড়তেই মানুষটা আবারো কাঁপতে শুরু করল। বুঝতে পারলাম– লোকটা আরেকবার নেকড়েতে রূপান্তরিত হতে চলেছে।

এবার আর একবিন্দু সময় না নষ্ট করে গাঁয়ের লোকেরা বল্লম বাগিয়ে ছুটে গেল মানুষটার দিকে। চোখ বন্ধ করে ফেললাম– এ ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। চোখ বন্ধ থাকলেও কানে ভেসে এলে মানুষটার মৃত্যুযন্ত্রণার আর্তনাদ, আর গাঁয়ের নর-নারীর উল্লাসধ্বনি।

কিছুক্ষণ পর উল্লাসধ্বনি আর হুটোপুটির শব্দ কমে আসার পর ধীরে ধীরে চোখ খুললাম। দেখতে পেলাম, গাছের নিচে কুঁকড়ে পড়ে আছে নির্জীব একটা দেহ। রক্তে ভেসে যাচ্ছে গাছতলা। গ্রামের মানুষের হাতে ধরা বর্শার আগা থেকে টপটপ করে ঝরছে লাল তাজা রক্ত। নাহ্, এবার নেকড়েতে রূপান্তরিত হবার মতো সময় পায়নি মানুষটা। তার আগেই জান দেহ ছেড়ে বের হয়ে গিয়েছে।

গাঁয়ের মাথা সিনমাকে বিড়বিড় করে কি যেন বলল। সিনমা একগাল হেসে আমাকে জানাল, গাঁয়ের মাথা আমাকে লোকটার দেহ পরীক্ষা করে জানাতে বলেছেন– অপদেবতাটা সত্যিই মরে গিয়েছে, নাকি এখনো জীবিত আছে।

নিজেকে ক্রস করে, রক্ত থেকে পা বাঁচিয়ে মাটিতে মানুষটার পাশে হাঁটু গেড়ে বসলাম। সাবধানে নাড়ি ধরলাম। না, কোনো পালস নেই। সত্যিই মরে গিয়েছে লোকটা।

সিনমাকে কথাটা জানালাম। তা শোনার পর গ্রামবাসী উল্লসিত হয়ে নাচানাচি করা শুরু করল। গাঁয়ের মাথা আরও একটি ঘোষণা দিল– ভোরে অপদেবতার লাশ পুড়িয়ে ফেলা হবে। আজ রাতটা আপাতত গাঁয়ের বাইরে চাটাই দিয়ে মুড়ে লাশটাকে একটা পরিত্যক্ত কুঁড়েঘরে ফেলে রাখা হবে।

ভারাক্রান্ত মনে নিজের ঘরে ফিরে এলাম। চোখের সামনে কত সহজেই না একজনকে মেরে ফেলা হলো। হোক না সে একটা নেকড়ে মানব বা অন্য কিছু। সবারই বেঁচে থাকার সমান অধিকার রয়েছে। মনের দুঃখ চেপে বিছানায় এলিয়ে দিলাম নিজেকে। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুমের রাজ্যে হারিয়ে গেলাম।

পরদিন সকালে সিন্‌মার ধাক্কাধাক্কিতে ঘুম ভাঙল। সে আশ্চর্য একটা খবর দিল আমাকে। ভোরবেলা গ্রামের লোকেরা গিয়েছিল লাশটাকে পুড়িয়ে ফেলার জন্য। তারা কুঁড়েঘরে ঢুকে দেখে– কি কাণ্ড! লাশটা বেমালুম গায়েব। চাটাই শতচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে আছে। কুঁড়ের পেছনে রক্তাক্ত পায়ের ছাপ, যা বনের ভেতর হারিয়ে গেছে।

এর পরের ঘটনা সামান্য। অপদেবতার আক্রোশ থেকে বাঁচার জন্য দু'সপ্তাহ ধরে গ্রামবাসী নানা ধর্মীয় অনুষ্ঠান, উপাসনার আয়োজন করেছিল। এরপর অবশ্য সেই নেকড়ে মানবের আর কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি। গ্রামের খোঁয়াড় ও গোয়ালেতেও আর কোনো হামলা হয়নি। আমিও ক'দিন পর বাংলাদেশ ছেড়ে গোয়াতে চলে যাই।

তারপর বিস্তর পড়াশোনা করেছি নেকড়ে মানব প্রসঙ্গে। জানতে পারলাম এদের স্বাভাবিক মৃত্যু হয় না। আক্ষরিক অর্থেই তারা অমর। এদের হত্যা করা সম্ভব

একমাত্র রুপোর বুলেট দিয়ে। সত্যিকার অর্থে নেকড়ে মানব বলে নাকি কিছুই নেই। লিকেনথ্রোপ বলে একটা অসুখ আছে, কিন্তু আমি যা দেখেছি তা কোনো লিকেনথ্রোপের ঘটনা নয়। নেকড়ে মানব যদি সত্যিই কাল্পনিক একটি প্রাণী হয়ে থাকে, তবে আমি যা দেখেছিলাম তা কি ছিল?...

এখানেই লেখা শেষ। আমি কাগজগুলো হাতে নিয়ে কিছুক্ষণ সজীবের দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে রইলাম। সজীব ওমলেট শেষ করে আরেক কাপ চায়ে চুমুক দিচ্ছিল, তাকিয়ে আছি দেখে জিজ্ঞেস করল, "তারপর, পড়া শেষ তোর? তো, কি মনে হলো?"

আমি কোনো জবাব না দিয়ে চুপচাপ বসে রইলাম।

যোদ্ধা

—"তোদের মামাটা একটা গাধা।" মা রাগত স্বরে বললেন। ঝন্টুটা আবার একটু ত্যাঁদর টাইপের, সে সাথে সাথে প্রশ্ন করল, "কোন মামা?"

—"কে আবার? তোমার আদরের ছোট মামা।" মা জবাব দিলেন।

আমি বাধা দিতে যাচ্ছিলাম, "মামা আবার কি দোষ করল?" কিন্তু ঠিক তখনই ছোট মামার আবির্ভাব ঘটল। সে এতক্ষণ বাইরে দাঁড়িয়ে সব কথাই চুপচাপ শুনেছে। "কি ব্যাপার আপা? সাবজেক্ট শুনে মনে হলো আমার কথাই বলা হচ্ছে?" মামা একগাল হেসে বলল।

মা সে প্রশ্নের জবাব না দিয়ে "হুঁ" জাতীয় শব্দ করে ভেতরে চলে গেলেন। মামা একটু চিন্তিত মুখ করে মন্তব্য করল, "তোদের বাড়িতে আমি এলেই কোনো না কোনো দুর্ঘটনা ঘটে যায়। আজ আবার কি হলো?"

মামা খেয়ালই করেনি যে সে কথা বলতে বলতে একটা কাচের জারের ওপর হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছে। ধাক্কা লেগে জারটা শূন্যে একবার ডিগবাজি দিয়ে মেঝেতে আছড়ে পড়ে ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। আমরা হৈ হৈ করে লাফাচ্ছি। মামার মুখে আত্মতৃপ্তির হাসি। রেপুটেশন বাঁচানো গিয়েছে!

কাচ ভাঙার শব্দ শুনে বাসার বুয়া ছুটে এলো। (তাকে প্রায়ই গ্লাস, প্লেট ভাঙার জন্য মা'র বকাঝকা খেতে হয়)। সে ভাঙা টুকরো দেখেই মেঝেতে বসে ডাক ছেড়ে কাঁদা শুরু করল, "ওয়া আল্লাগো। এহন কি হইব? আইজকা আমি গেছি! এহনি খালাম্মা আইয়া পড়ব। এহনি ফাল পাড়ন শুরু হইব।"

মামা বুয়াকে কড়া এক ধমক লাগল, "চুপ। আর একটা কথা বললে মুখে কাপড় গুঁজে দেব। শাট আপ ইমিডিয়েটলি।"

চেঁচামেচি শুনে মাও ভেতরে ঘর থেকে বের হয়ে এলেন। মামার ওপর দিয়ে একটা ঝড় বয়ে যাবে, এমন আশঙ্কা করছিলাম, কিন্তু তা আর হলো না। মা শুধু মামার দিকে একবার অগ্নিদৃষ্টি হেনে ডাস্টার এনে ঝাড়ন দিয়ে কাচ তোলা শুরু করলেন। মামার মহাআনন্দ; ধেই ধেই করে নাচতে লাগল।

—"এক্সিডেন্ট করার একটা রেকর্ড করে ফেললাম, কি বলিস? যখনি তোদের বাসায় আসি, ফুটুস করে কোনো না কোনো একটা দুর্ঘটনা হয়। চল, আর সময় না নষ্ট করে আমাদের গল্প বলার ঘরে যাই।"

আমরা আমাদের গল্প বলার ঘর (স্টোররুম)-এ গেলাম। মামা পুরনো একটা বেতের চেয়ারে আরাম করে বসে প্রশ্ন করল, "আজ কি গল্প শুনবি তোরা? ভূতের গল্প?"

ঝন্টু আপত্তি জানাল, "না মামা। ভূতের গল্প শুনব না। তার চেয়ে বরং একটা মুক্তিযুদ্ধের গল্প বলো।"

মামা ঝন্টুর আবদার শুনে চুপ করে রইল কয়েক মুহূর্ত। তারপর নিচু গলায় বলল, "দাঁড়া, আজ তোদের একটি মুক্তিযোদ্ধা ভূতের গল্প শোনাই।"

—"মুক্তিযোদ্ধা ভূত? সে আবার কি রকম!!" আমাদের মধ্যে চেঁচামেচি শুরু হয়ে গেল। গণ্ডগোল থামার পর মামা গল্প বলা শুরু করল।

—"১৯৭১ সাল। সেপ্টেম্বর মাসের দিকের ঘটনা। সে বছর আমি কলেজে ভর্তি হয়েছিলাম। যুদ্ধ শুরু হতেই কোনো দিকে না তাকিয়ে অস্ত্র হাতে নেমে পড়ি। ভারতে ট্রেনিং শেষে আমি কুন্ডলপুর গেলাম। আমাদের মুক্তিযোদ্ধা টিম সে সময় খুব স্ট্রং ছিল। পাকিস্তানের হানাদার বজ্জাত পাকসেনারা কিছুতেই আমাদের আক্রমণের মুখে পেরে উঠতে পারছিল না। এক সময় আমাদের প্রবল প্রতিরোধের মুখে পাকসেনারা কুন্ডলপুর থেকে হটে যেতে বাধ্য হয়। এটা অবশ্য আমাদের কমান্ডারের কৃতিত্ব। তাঁর ক্ষুরধার বুদ্ধি আর সঠিক নির্দেশ না মেনে চললে আমরা কখনোই হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে পেরে উঠতে পারতাম না।

তারপর, হঠাৎ এক রাতে খবর এলো, পুরো এক প্লাটুন পাকিস্তানি সৈন্য আমাদের ক্যাম্প এটাক করতে আসছে। স্থানীয় কিছু রাজাকার ওদেরকে সব তথ্য দিয়ে দিয়েছে। ওরা এবার অনেক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আসছে। মর্টার, স্টেনগান, এল.এম.জি. ইত্যাদি ইত্যাদি।

আমরাও দ্রুত যে যেভাবে পারি, প্রস্তুত হলাম। ক্যাম্পের চারপাশে সবাই সতর্কাবস্থায় থাকলাম। পালিয়ে যাবার কোনো উপায় ছিল না। কারণ খবর পাচ্ছিলাম– পাকিস্তানি হানাদারগুলো ধীরে ধীরে আমাদের চারদিক থেকে ঘিরে ফেলছে।

সেই রাতেই ঠিক তিনটার সময় গোলাগুলি শুরু হয়ে গেল। একেবারে খণ্ড যুদ্ধ যাকে বলে। ওরা ধীরে ধীরে কাছে এসে একসময় গ্রেনেড চার্জ করা শুরু করল। উড়ে গেল আমাদের ক্যাম্পের একাংশ। তারই সাথে মর্টারের আঘাতে আমাদের বেশ কয়েকজন সেখানেই শহীদ হন।

পাকিস্তানিরা দ্রুত আমাদের কোণঠাসা করে ফেলল। আমি তখনো নিজের পজিশনে থেকে স্টেনগান দিয়ে সমানে গুলি করে যাচ্ছি। গুলি করতে করতে

আশেপাশে তাকালাম। বেশিরভাগ যোদ্ধা পিছু হটে গিয়েছে। আমার পজিশনে কেবলমাত্র আমিই একা যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছি। হঠাৎ আমার পাশে মাটিতে ক্রলিং করে এক লোক হাজির হলো। তার হাতে একটা এস.এম.জি.।

অন্ধকার হলেও মর্টারের বিস্ফোরণে এলাকা কিছুক্ষণ পর পর আলোকিত হয়ে ওঠায় আশপাশ মোটামুটি পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল। সেই আলোতে লোকটাকে একনজর দেখে নিলাম। লোকটা বেশ রোগামতন, নাকটা মনে হলো একটু ভাঙা। একমুখ খোঁচা খোঁচা দাড়ি। কপালে লম্বা একটা কাটা দাগ। একটা ময়লা গেঞ্জি আর লুঙ্গি পরা। লোকটা আমার দিকে তাকিয়ে হাসল। কিন্তু লোকটা তো আমাদের টিমের কেউ নয়। আমি স্টেনগান তার দিকে বাগিয়ে ধরে কঠিন গলায় হুংকার ছাড়লাম। "আর একটুও নড়বে না! কে তুমি? কি করছ এখানে?"

লোকটা তার এস.এম.জি. থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে চাপা স্বরে জবাব দিল, "ভয় পাবেন না। আমার নাম আক্কাস। এই কুন্ডলপুরেই আমার বাড়ি। কমান্ডার স্যার আমাকে ভালো করেই চেনেন। আজ আমার দলে ঢোকার কথা ছিল। একটু দেরিই হয়ে গিয়েছে। আমার কথা বিশ্বাস না হলে পরে কমান্ডারকে আমার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করে দেখবেন। এখন আসেন বজ্জাতগুলোকে থামাই।"

তার কথা শুনে কিছুটা আশ্বস্ত হয়ে আবারও পাকবাহিনীর ওপর গুলিবর্ষণ করা শুধু করলাম। আক্কাসের কথা শোনার পরও তাকে চোখে চোখে রাখছিলাম। যুদ্ধ চলতে লাগল। একসময় আমাদের পক্ষ থেকেও ওদের ওপর গ্রেনেড চার্জ করা শুরু হলো। আক্কাসের কি নিখুঁত নিশানা। কিছুক্ষণের মধ্যে তারই কল্যাণে যুদ্ধের হাওয়া বদলে গেল। কত সংখ্যক পাকিস্তানি যে সেদিন তার গুলিতে মারা পড়ল, তা বলা মুশকিল। যাই হোক, যুদ্ধের হাওয়া বদলে যেতেই হানাদাররা বুঝতে পারল গতিক খারাপ। সব একসময় রণে ভঙ্গ দিয়ে বাপবাপ করে পালাল।

গোলাগুলি কমে আসতেই আক্কাস হঠাৎ মাটি ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। পুবের আকাশ তখন ক্রমশ ফর্সা হয়ে উঠেছে। পাখির কলকাকলি শোনা যাচ্ছে। আক্কাস ভয়ার্ত কণ্ঠে বলল, "সকাল হয়ে আসছে। আমি যাই এখন।"

আমি কিছু বলার আগেই সে এস.এম.জি. হাতে দৌড়ে আবছা অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। সামনের দিকে লক্ষ্য করে ফাঁকা আরো কয়েকটা গুলি চালালাম। জবাবে কোনো গুলি ছুটে এলো না। নাহ্, মনে হয় পাকিরা সত্যিই ভেগে গিয়েছে। যখন নিশ্চিত হলাম যে কোনো পাকিস্তানি নেই, উঠে গেলাম পজিশন ছেড়ে। দেখলাম, কমান্ডার এগিয়ে আসছেন।

কমান্ডার এসে আমার কাঁধে হাত রাখলেন, "ভালোই খেল দেখিয়েছ। কি ফাইটই না করলে। আজ এ অসম্ভব যুদ্ধ তোমার অবদানের জন্যই সম্ভব হয়েছে। একা এ পজিশন এতক্ষণ ধরে রাখলে কি করে?"

আমি অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হয়ে বললাম, "কি বলছেন কমান্ডার?" আমার সাথে তো আরেক লোক ছিল। সেই তো এসে সব পাকিস্তানিদের ভাগাল। আপনি তাকে দেখেননি? এই তো একটু আগেই সে উঠে চলে গেল।"

কমান্ডার কপাল কুঁচকালেন, "কোন লোকের কথা বলছ তুমি? আমরা তো এতক্ষণ কেবল তোমাকেই দেখেছি!"

—"বলেন কি! আপনারা আক্কাসকে দেখতে পাননি?"

কমান্ডার আক্কাসের নাম শুনে একটু চমকে উঠলেন বলে মনে হলো। নিজেকে সামলে গম্ভীর গলায় এবার তিনি ধমক দিলেন, "কোনো আক্কাস? কে সে? কোথায় থাকে?"

এবার আমার অবাক হবার পালা, "কি আশ্চর্য, আপনি তাকে চেনেন না! কিন্তু....কিন্তু আক্কাস তো আমাকে বলেছে আপনি তাকে জানেন। এই গ্রামেরই লোক।"

কমান্ডারের কপালে আরও কয়েকটা ভাঁজ পড়ল। কম্পিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, "ওর একটু বর্ণনা দিতে পারবে?"

—"অবশ্যই কমান্ডার। সে একটু রোগামতো, ভাঙা নাক। কপালে কাটা দাগ আছে।"

কমান্ডার এবার ভীষণভাবে চমকে গেলেন। "কপালে কাটা দাগ? সেই আক্কাস! কিন্তু তা কেমন করে হতে পারে? অসম্ভব, এটা হতেই পারে না।"

—"খোদার কসম কমান্ডার, আমার সাথে যে ছিল তার নাম আক্কাস। কিন্তু আপনি এত বিচলিত হচ্ছেন কেন?"

কমান্ডার মুখ ঘুরিয়ে পূব আকাশের দিকে ফেরালেন। ভোরের সূর্যের কমলা আভা তার মুখে পড়ছিল। দীর্ঘশ্বাস ফেললেন তিনি। "শোনো তবে। তখন এপ্রিল মাস। আক্কাস আমাদের টিমেই ছিল। মারাত্মক যোদ্ধা ছিল সে। একদিন বাজার থেকে ফেরার সময় পাকিস্তানি সেনাদের হাতে সে ধরা পড়ে। অকথ্য নির্যাতনের পর তাকে গুলি করে হত্যা করে ধানক্ষেতে ফেলে রাখা হয়। তাকে নিজ হাতে আমি কবর দিয়েছি। তাই আক্কাসের নাম শুনে আমি এতটা অবাক হচ্ছি। কিন্তু তুমি যে বর্ণনা দিয়েছ, তা আক্কাসের ক্ষেত্রে অক্ষরে অক্ষরে মিলে যায়।"

মামা সেখানেই তার গল্প শেষ করল। ছোট্ট একটা শ্বাস ফেলে বলল, "এমন ঘটনা কি কখনো ঘটা সম্ভব? আজও আমি সে ঘটনার কোনো কূলকিনারা করতে পারিনি। ওটা যদি আক্কাস না হয়ে থাকে, তবে ওটা কি ছিল? আক্কাসের আত্মা?"

মামার কথা শেষ হতেই ইলেকট্রিসিটি চলে গেল। মামা গা ঝাড়া দিয়ে উঠে বলল, "দুর ছাই! কারেন্ট যাবার আর সময় পেল না। এখন রাস্তায় একটা রিকশা পেলেই হয়।"

–"তো ডক্টর, আমার কি পজেটিভ, না নেগেটিভ?" শার্টের বোতাম লাগাতে লাগাতে সামনে দাঁড়ানো তরুণ ডাক্তারটিকে আমি প্রশ্ন করলাম।

ডক্টর ফয়সল আমার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে কঠিন দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন।

—"আপনি কিন্তু এখনো আমার প্রশ্নের জবাব দেননি ডক্টর", তাঁর দিকে ক্লান্ত দৃষ্টি তাকিয়ে মন্তব্য করলাম।

এবার ফয়সল মুখ খুললেন, "হ্যাঁ পজেটিভ। আপনার মধ্যে ওই রোগের সব লক্ষণই দেখা দিয়েছে। আমি দুঃখিত। এখন এটা কেবল সময়ের ব্যাপার। তারপর....."

—"জানি ডক্টর, জানি। হাত তুলে বাধা দিলাম। শার্টের গোটানো হাতা সোজা করে ফেললাম কনুইয়ের চারপাশে খয়েরি ছোপগুলো ঢাকার জন্য।

—"আমার হাতে কত সময় আছে ডক্টর?"

ডাক্তার ফয়সল হাতে ধরে রাখা আমার রিপোর্টগুলোতে একনজর চোখ বুলিয়ে নিলেন। তারপর সেগুলো একপাশে রেখে টেবিলের কিনারায় বসে জবাব দিলেন, "আপনি এখন মোটামুটি লেট স্টেজেই আছেন– যেটাকে আমরা বলি স্টেজ টু। স্টেজ ওয়ান থেকে স্টেজ টুতে আসতে অনেক সময় লাগে, কিন্তু স্টেজ টু থেকে ফাইনাল স্টেজগুলোতে আসতে খুবই অল্প সময় নেয়। আপনাকে বড়জোর এক সপ্তাহ দেয়া যায়। তারপর....."

আমি আবারো তার কথায় বাধা দিলাম, "তারপর আমি মারা যাব এবং ফিরে আসব না-মানুষ হয়ে, ঠিক?"

ডক্টর ফয়সাল গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে সায় দিলেন।

—"ওয়েল, থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাচ ডক্টর", আমি উঠে দাঁড়ালাম। "আপনাকে কত পেমেন্ট করতে হবে বলুন।"

ফয়সল শীতল কণ্ঠে জবাব দিলেন, "টাকা দিয়ে এখন আর কি হবে? তবে আপনাকে একটা কথা বলব, কিছু মনে করবেন না। আমার কথাটা হলো– আপনি

এখন কি করবেন? আপনার দেহে রোগটির সকল উপসর্গ দেখা দিয়েছে। এটাও সত্যি যে আপনি না-মানুষ হয়ে ফিরে আসবেন।"

ডক্টর একটু থামলেন। "তো আপনি এখন কি পদক্ষেপ নেবেন? আপনি কি চান না-মানুষ হয়ে ফিরে আসতে? আই মিন, কে চায়? অনেকেই কিন্তু না-মানুষ হওয়া এড়িয়ে গিয়েছে। আপনিও তাই করতে পারেন। আপনি....."

—"আপনার মূল্যবান উপদেশের জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ ডক্টর", তাঁর কথার স্রোত থামাবার জন্য আমি উঠে দাঁড়ালাম। "আপনি যে এই পন্থার কথা সাজেস্ট করবেন, তা আমার খুব ভালো করেই জানা ছিল। শুনুন, আমি নিজেই বেশ কয়েকজনকে মুক্তি দিয়েছি। দরকার কেবল একটা পিস্তল, আর একটা বুলেট। তারপর বুলেট সোজা মাথায় চালান, তাই-না? হা-হা! আমাকে নিয়ে আপনার চিন্তা করার দরকার নেই ডক্টর। আমার ব্যবস্থা আমিই করব।"

বের হয়ে যেতে চাচ্ছিলাম, ডক্টর ফয়সাল আমার পথ আটকে দাঁড়ালেন। উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন, "দাঁড়ান একবার। আমার কথা শুনুন। ওরকম যন্ত্রণাদায়ক পথ ছাড়াও অন্য উপায় আছে। আমি আপনাকে সাহায্য করতে পারি এ ব্যাপারে। আপনাকে একটা চেতনানাশক দেয়া হবে। তারপর আপনার মগজ ধ্বংস করে ফেলার দায়িত্ব আমার। প্রায় যন্ত্রণামুক্ত মৃত্যু। না-মানুষ হয়ে ফেরার কোনো উপায় থাকবে না। একবার চিন্তা করে দেখুন।"

—"ডক্টর, আপনার অনেক মেহেরবানী।" হাত জোড় করে বললাম। "কিন্তু আমার সত্যিই কারও সাহায্যের প্রয়োজন নেই। আবারও বলছি, আমার ব্যবস্থা আমি নিজেই করতে পারব। এবার আমার পথ ছাড়ুন। আমাকে বাসায় ফিরতে হবে।"

—"ঠিক আছে।" ফয়সল সরে গেলেন। এখন তাঁর চোখের দৃষ্টি কোমল হয়ে এসেছে। "আশা করছি আপনি ঠিক জিনিসটাই করবেন।"

আমি বের হয়ে আসার আগ মুহূর্তে থেমে ফয়সলকে উদ্দেশ্য করে প্রশ্ন ছুড়ে দিলাম। "আচ্ছা, এবার বলুন তো ডক্টর, আপনার এ রোগ হবার সম্ভাবনা কতটুকু?"

ফয়সল বোধহয় আমার এ প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। চমকে উঠলেন এই প্রশ্ন শুনে। বিড়বিড় করে কি যেন জবাব দিলেন।

—"আমি আপনার কথা শুনতে পাচ্ছি না ডক্টর", ভ্রূ কুঁচকে বললাম।

—"শতকরা নিরানব্বই ভাগ সম্ভাবনা আছে", এবারে শক্ত গলায় ফয়সল জবাব দিলেন।

আমি বাঁকা হাসি হাসলাম, "আরও একটা কথা চিন্তা করুন ডক্টর। আজ আপনি জীবিত বাড়ি ফিরবেন, তারওবা কি নিশ্চয়তা? পথেই তো না-মানুষগুলো আপনাকে হত্যা করতে পারে, ঠিক?"

ফয়সল জবাব না দিয়ে একদৃষ্টিতে কার্পেটের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

—"গুডবাই ডক্টর!" দন্ত বিকশিত করে আমি বললাম, "আমাদের সবার ব্যবস্থাই শেষ পর্যন্ত আমাদের নিজেদেরই করতে হবে। কারণ এমন একটা সময় আসছে যখন সাহায্য করার মতো আর কেউই থাকবে না। কথাটা মনে রাখবেন। এবার তাহলে আসি ডক্টর। খোদার কাছে আমার একটাই প্রার্থনা– আপনি নিজেও যেন না-মানুষ হবার আগে সঠিক পন্থা প্রয়োগ করতে পারেন।"

বের হতেই ফয়সল সশব্দে আমার পেছনে দরজা বন্ধ করে দিলেন। নিচে নেমে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ কি মনে হওয়ায় ফিরে এসে ওনার দরজায় টোকা দিলাম।

—"কি ব্যাপার?" ঝটতি দরজা খুলে ক্ষুব্ধ কণ্ঠে ফয়সল জিজ্ঞেস করলেন।

—"আর একটা কথা ছিল ডক্টর", আমি ক্লান্ত কণ্ঠে বললাম। "আপনি নিশ্চয়ই বিয়ে করেছেন?"

—"হ্যাঁ, তো?

—"আপনার ছেলেমেয়ে কয়জন?"

—"তা জেনে আপনার দরকারটা কি?" ফয়সল আরও একটু ক্ষেপে গেলেন।

—"দরকার আছে। কৌতূহল হচ্ছে।"

—"ভাই দেখেন। আপনি এখন চলে যান। আমাকে আর দয়া করে বিরক্ত করবেন না। আপনার আমাকে যে দরকার ছিল, তা ফুরিয়ে গিয়েছে। এবার দয়া করে আমাকে মুক্তি দিন।" ফয়সল দরজা বন্ধ করে দিতে উদ্যত হলেন।

—"প্লিজ ডক্টর।" আমি হাত দিয়ে দরজা আটকালাম। "আমার প্রশ্নের জবাব দিন। ধরে নিন এটা একজন মৃত্যুপথযাত্রীর অসুস্থ কৌতূহল।"

—"ঠিক আছে।" ফয়সল কঠিন গলায় বললেন। "আশা করছি আমার উত্তর শোনার পর আপনি চলে যাবেন। হ্যাঁ, আমার একটা বাচ্চা আছে– মেয়ে। নাম লামিয়া। বয়স পাঁচ বছর। আর কোনো প্রশ্ন আছে আপনার?"

—"হ্যাঁ, আরও একটা প্রশ্ন আছে", আমি জবাব দিলাম। "ধরুন, তারও একসময় রোগটা হলো। তখন আপনি কি করবেন?"

—"ইউ আর এ বাস্টার্ড।" দাঁত খিচিয়ে ফয়সল দরজা বন্ধ করে দিতে উদ্যত হলেন, আমি পা বাড়িয়ে দরজা আটকে দিলাম।

—"আমার কথার জবাব দিন। পারবেন, আপনার এত আদরের, ভালোবাসার বাচ্চাটিকে হত্যা করতে? পারবেন তাকে না-মানুষ হওয়া থেকে বাঁচাতে?"

—"আপনি যাবেন এখান থেকে?" ফয়সল এবার চিৎকার করে উঠলেন। "নইলে আমি....আমি!"

—"শেষ কথা ডক্টর। শান্ত হোন। আমি এখনি চলে যাচ্ছি।" আমি জানালাম। "আপনাকেও আমার একটা উপদেশ– যখন সময় আসবে, তখন সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে যেন আপনার দেরি না হয়। যাবার আগে একটা কথা বলে যাই। ভালোবাসার মানুষদেরই সবচেয়ে আগে সাহায্য করতে হয়। আমি নিজেই তা করেছি, একবার নয়, একাধিকার।"

ফয়সল আর কথা না বাড়িয়ে ধাম করে আমার মুখের ওপর দরজা লাগিয়ে দিলেন। তাঁকে আর বিরক্ত না করে ক্লিনিকের বাইরে রাখা আমার ছোট গাড়িটাতে উঠে গেলাম। বাসায় ফিরতে হবে। হাতে অনেক কাজ বাকি।

জানি না, কেন তাঁকে ইচ্ছা করে খোঁচা দিয়ে উত্তেজিত করেছি। কেন এতগুলো নির্মম কথার্বাতা বললাম তাঁকে? উনি তো আমার কোনো ক্ষতি করেননি, বরং সাহায্যই করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আমি যা বলেছি, তা সবই অক্ষরে অক্ষরে সত্যি। "দ্যা এন্ড ইজ নিয়ার।"

॥দুই॥

বাসায় ফেরার সময় লক্ষ্য করলাম, অন্যান্য সবদিনের তুলনায় আজ রাস্তাঘাট বেশ ফাঁকা। কয়েকটা ধুলোয় ধূসরিত গাড়ি আর রাস্তার পাশে উলটে থাকা কয়েকটা ভাঙা রিকশা ছাড়া আর কোনো যানবাহনই চোখে পড়েনি।

রাস্তাঘাট দীর্ঘদিন অবহেলিত হবার কারণে একদম জরাজীর্ণ হয়ে পড়েছে। গাড়ি এমনভাবে ঝাঁকাচ্ছিল যেন নাটবল্টু সব খুলে আসবে। পিচঢালা রাস্তার বিভিন্ন অংশ ফেটে, ক্ষয়ে ইট-পাথর বের হয়ে এসেছে।

ইতস্তত দু'একটা না-মানুষও চোখে পড়েছে। সাধারণত তারা দিনের বেলা খুব একটা বের হয় না। রাত নেমে এলেই এরা পালে পালে বের হয়ে আসে খাদ্যের সন্ধানে। অবশ্য যেদিন সূর্য মেঘের আড়ালে ঢাকা থাকে, তখন ছোটখাটো দলবেঁধে বের হয় তারা।

আজ আকাশটা মেঘলা। সন্ধ্যা হতেও খুব একটা দেরি নেই। ক্যান্টনমেন্টের সামনে দিয়ে যাবার সময় দেখলাম প্রচুর সৈনিক ক্যান্টনমেন্টের প্রবেশপথের সামনে মোতায়েন করে রাখা হয়েছে। মনে মনে হাসলাম– প্রবেশপথে পাহারা বসিয়েছে; যেদিন ভেতর থেকে হামলা হবে, সেদিন কি করবে? এমনিতেই সারাদেশে বোধহয় সর্বমোট শ'পাঁচেক আর্মি অবশিষ্ট রয়েছে। একই সাথে দৃশ্যমান এবং অদৃশ্য ঘাতকের সাথে লড়াই করার শক্তি কি ওদের আছে?

ধানমন্ডি এসেই মনটা একটু খারাপ হয়ে গেল। মার্চের ভয়াবহ সেই অগ্নিকাণ্ড পুরো এলাকার এক-তৃতীয়াংশ পুড়িয়ে ছারখার করে দিয়েছে। দুই হাজার মানুষ জ্যান্ত পুড়ে গিয়েছিল সেদিন। ফায়ার সার্ভিসে ফোন দিয়েও লাভ হয়নি, আগুন থামার জন্য পর্যাপ্ত লোকবল ছিল না। ফায়ার ব্রিগেডের গাড়ি চালাবে কে? ওদের অনেকেই তো না-মানুষ হয়ে গিয়েছে!

অন্যদের সাথে সেদিন আমিও পানির বালতি নিয়ে ছুটে গিয়েছি। আগুন থামাবার সকল প্রচেষ্টাই বিফলে যায়। একটা দৃশ্য এখনো আমার চোখে ভাসে- জ্বলন্ত সুউচ্চ বিল্ডিংগুলো থেকে নিচে ঝাঁপিয়ে পড়ছে মানুষগুলো; সর্বাগ্রে ধরা আগুনের কাছে উচ্চতা তুচ্ছ হয়ে গিয়েছে। যারা নিচে পড়েছিল, হাতেগোনা দু-একজন ছাড়া কেউই বাঁচতে পারেনি। অবশ্য তাদের মৃত্যু অনেক দ্রুত এবং তুলনামূলকভাবে শান্তির মৃত্যু। যারা বাড়িগুলোর ভেতর আটকা পড়ে আগুনের ধোঁয়ায় শ্বাসরুদ্ধ হয়ে, আগুনের তাপে জীবন্ত ঝলসে মারা গিয়েছে, তাদের কথা চিন্তা করলেই গা কাঁটা দিয়ে ওঠে।

বাসায় পৌঁছাবার আগে উল্লেখযোগ্য একটাই ঘটনা ঘটেছে। কলাবাগানে বাসার কাছে পৌঁছানো মাত্র কোত্থেকে একটা নারী না-মানুষ গাড়ির সামনে ঝাঁপিয়ে পড়ল। আমিও বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না করে চাপা দিয়েছি ওটাকে। চাপা দিয়ে খানিকটা এগিয়ে গিয়ে পেছন ফিরে দেখি– মরে নাই। ধীরে ধীরে আবারো উঠে দাঁড়াচ্ছে। না-মানুষটার একটা হাত ভেঙে চামড়া ছিঁড়ে হাড় বের হয়ে গিয়েছে। চোয়াল থেঁতলে ডানপাশের গালের চামড়া ফেড়ে গিয়েছে। ওটাকে আর না ঘাঁটিয়ে একটানে গাড়ি নিয়ে গলির ভেতর বাসার সামনে চলে এলাম।

গাড়ি গ্যারেজে ঢুকিয়ে বাসায় ঢোকার আগ মুহূর্তে সামনের বাসার তিনতলার জানালার দিকে তাকালাম। তিনতলার ওই ফ্ল্যাটে অত্যন্ত কৌতূহলী এক বৃদ্ধা বাস করেন। তাঁর কাজই হলো কোন্ বাসায়, কোনো তলায় কি হচ্ছে তা বসে বসে জানালা দিয়ে দেখা। ভদ্রমহিলা আমাকে কেন যেন একটু এড়িয়েই চলেন। আমাকে দেখলেই পর্দা টেনে দেন। আজও কোনো ব্যতিক্রম হলো না। আমি তাকাচ্ছি দেখে বৃদ্ধা জানালার পর্দা টেনে ভেতরে চলে গেলেন।

এখন অবশ্য এ পাড়ায় আমি আর সামনের বাসার ওই বৃদ্ধা ছাড়া বোধহয় আর কেউই নেই। তারপরও বৃদ্ধা সারাদিন জানালা দিয়ে কি দেখেন আল্লাহ মালুম। আমার ক্ষীণ সন্দেহ, মহিলার মাথায় বোধহয় ছিট আছে।

সিঁড়িঘরে দীর্ঘদিনের ময়লা জমেছে। কলার খোসা, থেঁতলানো সিগারেটের বাক্স, ছেঁড়া পলিথিন, পচা উচ্ছিষ্ট ইত্যাদি ইত্যাদি। বাতাসে বোটকা গন্ধ– প্রতিদিন সিঁড়ি বেয়ে ওঠানামা করছি। কিন্তু এখনো গন্ধটায় অভ্যস্ত হয়ে উঠতে পারিনি। সিঁড়িঘরে বাল্ব নষ্ট বলে আধো অন্ধকারে রেলিং ধরে ধরে দোতলায় উঠতে হলো। এখন থেকে মনে করে পকেটে ছোট্ট একটা টর্চ রাখতে হবে। কোনো দিন পিছলে পড়ে পা ভেঙে ফেলব, তার কি কোনো ঠিক আছে নাকি?

পকেট থেকে চাবি বের করে দরজা খুলে ফ্ল্যাটে ঢুকে আলো জ্বালিয়ে দিলাম। দরজা ভেতর থেকে লক করে ছিটকানিটাও লাগিয়ে দিলাম। সাবধানের মার নেই। না-মানুষগুলোর সাহস বড্ড বেড়েছে। উড়ো খবর পেয়েছি আজকাল রাতের বেলা বাসাবাড়িতেও নাকি হামলা চালাচ্ছে ওরা। তাছাড়া আমি নিজেই লক্ষ্য করেছি, রাত হলেই কয়েকটা না-মানুষ এই গলিটার ভেতরে চলাফেরা করে। মাঝেমধ্যে ইচ্ছা করে, ওপর থেকে বসে বসে গুলি করে ওদের খুলি উড়িয়ে দেই। পরক্ষণেই ভাবি–দরকার নেই। খামোখা ওদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বিপদ ডেকে আনার কোনো মানে হয় না।

বাসার কাজের ছেলেটাকে গত মাসেই বিদায় করে দিয়েছি। রান্নাটা নিজেকেই করতে হচ্ছে। ভাগ্য ভালো যে বিদ্যুৎ আর পানি এখনো পাচ্ছি। তাও কবে বন্ধ হয়ে যায়, তার কোনো ঠিক নেই। ফোন বিকল হয়ে পড়ে আছে গত এক বছর ধরে। কোনো মোবাইল ফোনও কাজ করছে না দীর্ঘদিন যাবৎ।

হাঁড়িতে ভাত চড়িয়ে ফ্রিজ থেকে কোকের ক্যান বের করে টিভির সামনে বসলাম। কোক, চিপস, প্যাকেট খাবার– সবই পাচ্ছি কাছেই পরিত্যক্ত একটা সুপারস্টোর থেকে। তবে কতদিন এই সরবরাহ অব্যাহত থাকবে তা বলা যাচ্ছে না। ক্ষুধার্ত মানুষ দিনের বেলা দলে দলে এসে প্রায়ই নানা দোকানপাট থেকে খাবারদাবার লুট করে নিচ্ছে।

টিভিতে এখন কেবলমাত্র দুটো চ্যানেল কাজ করছে– বিবিসি আর সি.এন.এন.। অন্যান্য সকল স্যাটেলাইট চ্যানেলের সম্প্রচার বন্ধ। বিটিভি শেষ সম্প্রচার করেছিল ছ'মাস আগে।

সি.এন.এনের অধিবেশন শুরু হয়নি দেখে চ্যানেল বদলে বিবিসি দিলাম। ক্লান্ত, বিধ্বস্ত চেহারার এক শ্বেতাঙ্গ কাঠ কাঠ শুষ্ক কণ্ঠে খবর পড়ছে। সেই পুরনো কাসুন্দি– বিজ্ঞানীরা এখনও আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছে রোগের প্রতিষেধক তৈরি

করতে। চিন্তা করার কোনো কারণ নাই, খুব শিগরিই একটা 'ব্রেক থ্রু' হতে যাচ্ছে–এরকম নানা আশার বাণী। ব্রিটিশ প্রাইম মিনিস্টার টমি হেস্টিংসেরও একটা রেকর্ডিং দেখাল বিবিসি– আবেগজড়ানো কম্পিত কণ্ঠে হেস্টিংস সবাইকে ধৈর্য ধরতে বলছেন, সেই একই আশার বাণী শোনাচ্ছেন।

আশা! আমি কোকের ক্যানে লম্বা চুমুক দিয়ে তাচ্ছিল্যের হাসি হাসলাম। টমি হোস্টিংস মারা গিয়েছেন আজ চার মাস হলো। না-মানুষ হয়ে তিনিও ফিরে এসেছিলেন। সেই তাঁরই রেকর্ডিং এতদিন পরে এখনও দেখাচ্ছে ব্যাটারা। এরা এত মাথামোটা কেন?

ভাত হয়ে যাবার পর ফ্রিজের বিস্বাদ ঠাণ্ডা তরকারি দিয়ে দ্রুত রাতের খাওয়া শেষ করলাম। এখন এক একটা দিন বেঁচে থাকাটাই যেন কষ্টের ব্যাপার। অবশ্য আমার তো আর কোনো চিন্তা নেই। বড়জোর আর এক সপ্তাহ টিকে থাকব। তারপর আর এত কষ্ট করে বেঁচে থাকতে হবে না।

শোবার ঘরে ঢুকেই মেজাজ খিঁচড়ে গেল। ব্যক্তিগত জীবনে আমি খুব একটা গোছানো মানুষ নই। কিন্তু আজ রাতে শোবার ঘরটা নিজের কাছেই খুবই অপরিষ্কার লাগছে। কত দিন হলো বিছানার চাদরটা ধোয়া হয়নি। চাদরের গায়ে ঝোল আর ময়লার দাগ স্পষ্ট। টেবিলের ওপর ধুলো পুরু হয়ে জমে আছে। ঘরের কোণে ফেলে রাখা নোংরা কাপড়-চোপড় থেকে বিকট গন্ধ বের হচ্ছে। সব মিলিয়ে অসুস্থ একটা পরিবেশ।

মাথায় কি ঝোঁক চাপল কে জানে– হয়তোবা করার কিছু নেই দেখেই-বিছানার চাদর তুলে আলমারি থেকে আরেকটা পরিষ্কার চাদর বের করে বিছিয়ে দিলাম। তারপর ভেজা একটা ন্যাকড়া দিয়ে বাসার সব আসবাবপত্র বেশ সময় নিয়ে পরিষ্কার করলাম। নোংরা কাপড়গুলো বাথরুমে রেখে দিলাম, কালকে ধুলেই হবে।

অন্যান্য দিন সময় একদমই কাটতে চায় না। আজ অবাক হয়ে লক্ষ্য করলাম, ঘর পরিষ্কার করতে গিয়ে কত দ্রুতই না সময় কেটে গেল। হাত-মুখ ধুয়ে যখন শোবার ঘরে ঢুকলাম তখন বাজে রাত দশটা। এমন গভীর কোনো রাত নয়, কিন্তু আমাদের এ পাড়ায় মানুষজন নেই বলেই চারদিক খুবই নীরব।

আমার এ চারতলা বিল্ডিংয়ে আমি ছাড়া আর কেউ নেই। আশপাশের বাড়িগুলোরও একই অবস্থা। মাত্র দু'তিনজন মানুষ এখনও এ এলাকায় বাস করছে। যার মধ্যে একজন হলো সামনের বাসার ওই বিধবা বৃদ্ধা মিসেস মজুমদার। উনি থাকলেও যা, না থাকলেও তা। একই কথা।

আমার বিছানা একদম জানালা ঘেঁষে। ঘরের বাতি নিভিয়ে বিছানায় বসলাম। বাইরের রাস্তা চাঁদের আলোয় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। হঠাৎ লক্ষ্য করলাম গলির মুখে রাস্তায় ল্যাম্পপোস্টের নিচে কে একজন দাঁড়িয়ে রয়েছে। জানালার আরেকটু কাছে সরে এলাম। ওটা কি কোনো মানুষ, নাকি 'না-মানুষ'? ঠিক বোঝা গেল না, তবে মানুষটা মনে হলো এদিকেই তাকিয়ে আছে। মিনিট পাঁচেক ওভাবে দাঁড়িয়ে থেকে মানুষটা ধীর গতিতে হেঁটে রাস্তার অন্য পাশে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। হেঁচড়ে হেঁচড়ে হাঁটার ভঙ্গি দেখেই বুঝে গেলাম, ওটা একটা না-মানুষ ছিল।

সামনের বিল্ডিংয়ের দিকে তাকালাম। মিসেস মজুমদারের ফ্ল্যাটে এখনো আলো জ্বলছে। ভদ্রমহিলা আজকাল সারারাতই আলো জ্বালিয়ে রাখেন। এত রাত পর্যন্ত কি করেন কে জানে? অথবা হতে পারে, অন্ধকারকে ভয় পান। হয়তো আলো জ্বালিয়ে রাখেন সেই কারণেই। ভদ্রমহিলার আচার-আচরণ সত্যিই অদ্ভুত। যেচে তাঁর সাথে আলাপ করতে গিয়েছি অনেকবার। কিন্তু প্রতিবারই আলাপ খুব একটা জমে ওঠেনি। নানা অজুহাত দেখিয়ে আমাকে এড়িয়ে গিয়েছেন। গত পাঁচ মাসে তাঁর সাথে আমার কথা হয়েছে হাতেগোনা কয়েকবার। শুনেছি মানুষ একা থাকলে নাকি পাগল হয়ে যায়– এ মহিলা কি করে এত দীর্ঘ সময় নিজে নিজে কাটান, তা সত্যিই ভাবার বিষয়। বইয়ে পড়েছি বুড়ো-বুড়িরা সাধারণত কথা বলার জন্য সবসময় মুখিয়ে থাকে। এই ধারণাটা মিসেস মজুমদারের বেলায় একদমই খাটে না।

শার্ট খুলে পাতলা একটা গেঞ্জি পরে নিলাম। যদিও জানালা দিয়ে দখিনা বাতাস বয়ে যাচ্ছে, কিন্তু তারপরেও ঘরের ভেতর বেশ গুমোট ভাব। বৃষ্টি হলেই বাঁচি।

পর্দা খোলা রেখেই শুয়ে পড়লাম। চমৎকার চাঁদের আলো বিছানায় এসে পড়ছে। আজকাল ইচ্ছে করে সঙ্গী হিসেবে কুকুর-বিড়াল কিছু একটা পুষতে। কিন্তু না-মানুষগুলোর সর্বগ্রাসী ক্ষুধার জ্বালায় ইদানীং কুকুর-বিড়ালের টিকিও দেখা যায় না।

গভীর রাতে ঘুম ভাঙল সদর দরজায় ধাক্কানোর বিকট শব্দে। ঘামে সারা শরীর ভিজে আছে আমার। কয়েক সেকেন্ড লাগল চোখ থেকে ঘুম তাড়াতে। ছুটে গেলাম কাপড়ের আলমারির দিকে। ড্রয়ার খুলে পিস্তল বের করে হাতে নিলাম। ড্রয়িংরুমের আলো জ্বালিয়ে সন্তর্পণে দৃঢ় পায়ে হেঁটে গেলাম সদর দরজার দিকে। দুম দুম শব্দ বেড়েই চলেছে।

দরজার পাশে দাঁড়িয়ে চাপা গলায় প্রশ্ন করলাম, "কে? কে দরজা ধাক্কায়?"ওপাশ থেকে ভয়ার্ত গলা ভেসে এলো, "আমি! দরজা খোলো নাজমুল। আমি মিসেস মজুমদার, খোদার দোহাই লাগে, জলদি দরজা খোলো!"

কালবিলম্ব না করে দরজার লক আর ছিটকানি খুলে ফেললাম। ঝড়ের গতিতে মিসেস মজুমদার ভেতরে ঢুকে নিজেই দরজা বন্ধ করে ছিটকানি তুলে দিলেন। তারপর দরজার দিকে পিঠ দিয়ে সটান দাঁড়িয়ে গেলেন। ভদ্রমহিলাকে দেখেই বোঝা গেল কোনো কারণে মারাত্মক উত্তেজিত তিনি। লম্বা লম্বা শ্বাস নিচ্ছেন। মুখমণ্ডল লাল হয়ে গিয়েছে বৃদ্ধার। চুল, বেশভূষা আলুথালু।

—"কি হয়েছে মিসেস মজুমদার? আপনি এখানে? এত রাতে?" অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

—"চুপ, চুপ!" কর্কশ কণ্ঠে বৃদ্ধা হিসহিস করে বললেন। "ওরা শুনে ফেলবে!"

—"কাদের কথা বলছেন? কে কি শুনে ফেলবে?"

—"ওই নর্দমার পোকাগুলো! ওই নরকের জানোয়ারগুলো"! মিসেস মজুমদার আর্তনাদ করে উঠলেন।

—"শান্ত হোন ম্যাডাম। আপনি না-মানুষগুলোর কথা বলছেন? ওরা কি করে..."

—"চোপ! খবরদার, ঘুণাক্ষরেও ওই নাম মুখে নেবে না!" ভদ্রমহিলা চিৎকার করে বললেন।

আমার মহিলাকে উদভ্রান্ত বলে মনে হচ্ছিল। তাঁর দিকে এক পা এগিয়ে গেলাম। "দয়া করে সুস্থির হয়ে বসুন মিসেস মজুমদার। খুলে বলুন কি হয়েছে।"

বৃদ্ধা জানালার কাছে ছুটে গেলেন। নিজের ফ্ল্যাটের দিকে আঙুল দিয়ে নির্দেশ করে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জবাব দিলেন, "ওরা আমার বিল্ডিংয়ে ঢুকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমি....আমি সুযোগ বুঝে পালিয়ে এসেছি। আমাকে থাকতে দাও এখানে। নইলে ওরা আমাকে মেরে ফেলবে।"

—"না-মানুষগুলো আপনাকে.....?"

এবারও বৃদ্ধা আমার কথায় বাধা দিলেন। একরকম ছুটে এসে আমার মুখ কঙ্কালসার হাত দিয়ে চেপে ধরে ঝাঁঝিয়ে উঠলেন, "চুপ! বলেছি না ওই নাম না নিতে! ওরা শুনে ফেলবে। নাম নিলে ওরা চলে আসবে। চুপ চুপ!"

—"এটা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন একটা ধারণা ম্যাডাম।" উনি মুখ থেকে হাত সরিয়ে নেবার পর সান্ত্বনার সুরে তাঁকে বোঝালাম। "ওরা স্রেফ কতগুলো চলমান ক্ষুধার্ত লাশ ছাড়া আর কিছুই না। আপনার যতক্ষণ ইচ্ছা হয়, যতদিন খুশি লাগে, এখানে থাকুন। আপনাকে কেউ বাধা দেবে না।"

আমার কোনো কথাই মিসেস মজুমদারের কানে গেল কিনা বুঝতে পারলাম না। তিনি কুঁজো হয়ে পর্দার আড়ালে দাঁড়িয়ে নিজের ফ্ল্যাটের দিকে নিষ্পলক তাকিয়ে আছেন।

—"মিসেস মজুমদার?..."

আমার ডাক শুনে বৃদ্ধা ঘুরে দাঁড়ালেন। তাঁর টকটকে লাল চোখ পড়ল আমার হাতে ধরা পিস্তলের ওপর।

—"অস্ত্র! তোমার কাছে অস্ত্র আছে?" এই প্রথম বৃদ্ধার চোখে আনন্দ খেলে গেল। "আরও আছে নাকি? দেবে আমাকে?"

আমি জবাব দেবার আগেই ভদ্রমহিলা রান্নাঘরের দিকে ছুটে গেলেন। ফিরলেন মাছ কাটার বড় ছুরিটা হাতে নিয়ে।

—"ওটা সাবধানে ধরুন মিসেস মজুমদার", আমি পিছু হটে বললাম। "ওটার ধার খুব বেশি। হাত কেটে যেতে পারে।"

—"হ্যাঁ!" বৃদ্ধা খুশিতে বাতাসে কয়েকবার ছুরিটা আন্দোলিত করলেন। তারপর খ্যাঁক খ্যাঁক করে হেসে আপনমনে বললেন, "এবার আসুক ওরা। মজা বুঝিয়ে দেব। আমার আদরের অর্ণবকে নিয়ে গিয়েছে ওরা। আসুক একবার। এই.....বুকে! এই.....চোখে!" বৃদ্ধা কোপ দেবার ভঙ্গি করলেন।

মনে পড়ে গেল, মিসেস মজুমদারের একমাত্র ছেলে অর্ণব মিনেসোটায় না-মানুষদের হাতে পড়ে মারা গিয়েছে। সে তার কর্মস্থল থেকে হেঁটে ফিরছিল। তখনি একদল না-মানুষ ওর ওপর হামলা চালায়। অর্ণবের লাশ দেখে শনাক্ত করতে নাকি বেশ কষ্ট হয়েছিল। পরে বুক পকেটে থাকা নাম সংবলিত কার্ড দেখে শনাক্ত করা

গিয়েছিল। লাশ দেশে আসতে পারেনি, ওখানেই পুড়িয়ে ফেলা হয়। আমেরিকান কর্তৃপক্ষ অবশ্য নির্বোধের মতো একটা কাজ করেছে। তারা অর্ণবের মৃত্যুর রিপোর্ট বৃদ্ধার কাছে পাঠিয়ে দেয়। শুনেছি ওটাতে কোনো এক জায়গায় লেখা ছিল, না-মানুষগুলো নাকি অনেক সময় নিয়েছিল....অর্ণবের দেহের বিভিন্ন অংশ ভক্ষণ করতে এবং খুব সম্ভবত সে তখনও জীবিত ছিল।

বৃদ্ধাকে অনেক কষ্টে শান্ত করে সোফায় বসালাম। চোখ দেখেই মনে হলো উনি যেন একটা ঘোরের মধ্যে রয়েছেন। ওনাকে বসিয়ে আমি রান্নাঘরে গেলাম ফ্রিজ থেকে ঠাণ্ডা পানি বের করতে। ভদ্রমহিলা মনে হচ্ছে কিছুটা অপ্রকৃতিস্থ হয়ে গিয়েছেন। ওনাকে পানি খাইয়ে শোয়ানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

বসার ঘরে ফিরে দেখি ভদ্রমহিলা আবারো জানালার সামনে কুঁজো হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। ওনার পেছনে গিয়ে দাঁড়াতেই মহিলা চমকে উঠলেন।

—"একটু পানি খান ম্যাডাম। শরীর ভালো লাগবে।" পানির গ্লাস সামনে বাড়িয়ে ধরলাম।

—"চোপ! কোনো কথা না। এদিকে আসো। দেখো!" বৃদ্ধা আমার হাত খামচে ধরে জানালার দিকে টেনে নিয়ে গেলেন।

মহামুসিবত হলো দেখি! ওনার জন্য কি আজ সারারাতই জানালার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে? এবার একটু বিরক্ত হয়ে যেদিকে নির্দেশ করছেন সেদিকে তাকালাম।

—"কি?" আমার চোখ বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয়ে গেল। বৃদ্ধার বিল্ডিং থেকে ডজনখানেক না-মানুষ বের হয়ে আসছে! ওরা বের হয়ে কিছুক্ষণ একদৃষ্টিতে ওপরে আমার ফ্ল্যাটের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর দুলতে দুলতে এগোতে শুরু করল আমার বাসার প্রবেশপথের দিকে।

—"খোঁজ পেয়ে গিয়েছে ওরা। আমাদের মেরে ফেলতে আসছে!" চিলচিৎকার করে উঠলেন মিসেস মজুমদার।

—"আলো!" চট্ করে বুঝে গেলাম না-মানুষগুলো কেন এদিকে আসছে। আশপাশের বিল্ডিংগুলোর মধ্যে কেবলমাত্র আমার আর মিসেস মজুমদারের ফ্ল্যাটেই আলো জ্বলছে। আলোই ওদের আকৃষ্ট করছে।

বাতির সুইচের দিকে হাত বাড়াতেই মিসেস মজুমদার আমার গেঞ্জি খামচে ধরলেন।

—"কি করছ তুমি?"

—"আমাকে আলো নেভাতে হবে। এই আলো দেখেই ওরা এদিকে আসছে।" উত্তেজিত কণ্ঠে জবাব দিলাম।

ভদ্রমহিলা গেঞ্জি আরও জোরে টেনে ধরলেন। "না, তুমি আলো নেভাবে না। আমি অন্ধকার সহ্য করতে পারি না। ওরা অন্ধকারেই হামলা করবে। তোমাকে আমি কিছুতেই আলো নেভাতে দেব না।"

—"গেঞ্জি ছাড়ুন। বিপদ আপনি নিজেই ডেকে আনছেন। আমাকে বাতি এখনই নেভাতে হবে।"

আমি সামনে এগোতেই মিসেস মজুমদার প্রাণপণে গেঞ্জি ধরে টান দিলেন। ফরাৎ করে গেঞ্জিটা ছিঁড়ে তাঁর হাতে চলে এলো।

কান ফাটানো চিৎকার করে মিসেস মজুমদার সভয়ে পিছিয়ে গেলেন। তাঁর বিস্ফারিত দৃষ্টি আমার উন্মুক্ত বুকের দিকে। পেছাতে গিয়ে চেয়ারে পা বেঁধে হুমড়ি খেয়ে পড়লেন মেঝেতে। পাশের টেবিলে ধাক্কা লেগে পানির গ্লাস মেঝেতে পড়ে ভেঙে খানখান হয়ে গেল।

—"মিসেস মজুমদার!" আমি আঁতকে উঠলাম।

—"না! খবরদার! কাছে আসবে না তুমি। তুমি ওদের একজন!" বৃদ্ধা ছুরি বাগিয়ে ধরলেন।

—"আপনি কি সব যা তা বলছেন?" প্রতিবাদ করেই খেয়াল হলো, গায়ের খয়েরি ছোপগুলো বুকের ওপর বেশ ভালোভাবেই ছড়িয়েছে। গেঞ্জি ছিঁড়ে খুলে ফেলায় বুকের ওপর ছোপগুলো স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে।

—"হ্যাঁ আমি ওই রোগে আক্রান্ত।" তাঁকে বোঝাবার চেষ্টা করলাম। "কিন্তু আমার হাতে এখনও সময় আছে। আমি ওদের একজন নই। বিশ্বাস করুন।"

ঠিক তখনি মিসেস মজুমদারের কাণ্ডজ্ঞান যেন সম্পূর্ণরূপে লোপ পেল। তিনি বিরাট এক ভুল করে বসলেন। হাতে ধরা ছুরিটা আমার দিকে ছুড়ে মেরে মেঝে থেকে উঠে ছুটে গেলেন দরজার দিকে। আমি স্বভাবজাত কারণে একপাশে লাফিয়ে সরে গেলাম। নিক্ষিপ্ত ছুরি পেছনের দেয়ালে ঠং করে আঘাত করে মেঝেতে ছিটকে পড়ল।

এই অল্প সময়ের মধ্যে সুযোগ পেয়ে মিসেস মজমুদার ত্বরিত গতিতে দরজার ছিটকারি খুলে বাইরে বের হয়ে গেলেন।

—"না মিসেস মজুমদার, যাবেন না।" আমি লাফিয়ে গেলাম দরজার দিকে, কিন্তু ততক্ষণে বড্ড দেরি হয়ে গিয়েছে। মিসেস মজুমদারের রক্তজল করা আর্তনাদ সিঁড়িঘর থেকে ভেসে এলো।

আমার ফ্ল্যাটের খোলা দরজা দিয়ে আসা আলো কিছুটা হলেও সিঁড়িঘরের অন্ধকারকে মোটামুটি দূর করতে সাহায্য করছিল। দরজা দিয়ে বের হয়ে দেখি, সিঁড়িঘরের নিচে একতলার দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন মিসেস মজুমদার।

বৃদ্ধা গলা দিয়ে ঘর্ঘর শব্দ করলেন। তাকিয়ে দেখি বাড়ির প্রবেশপত্র দিয়ে ঢুকছে বেশ কয়েকটা না-মানুষ। হাত বাড়িয়ে দিয়েছে মিসেস মজুমদারের দিকে। সিঁড়িঘরের ভেতরটা হঠাৎ পচা মাংসের গন্ধে কটু হয়ে গেল।

গুলি করতে করতে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলাম মিসেস মজুমদারের পাশে। তাঁর হাত চেপে ধরলাম। ওনাকে যেভাবেই হোক ওপরে নিয়ে যেতে হবে। কিন্তু উনি যেন পাথর হয়ে গিয়েছেন। তিনি হঠাৎ ওপরের দিকে তাকালেন। তাঁর কণ্ঠ বিদীর্ণ করে আরেকটা আর্তনাদ বের হয়ে এলো।

তাঁর দৃষ্টি অনুসরণ করে দেখতে পেলাম, তিনতলার সিঁড়ি বেয়ে নামছে তিনটি না-মানুষ। ওরা ওপরে গেল কি করে? আমরা দু'জন ফাঁদে আটকা পড়ে গিয়েছি– এ কথাটা আমার মাথায় আসতেই সব হিসাব কেমন যেন গণ্ডগোল হয়ে গেল।

পাগলের মতো চিৎকার করে ওপরের দিকে লক্ষ্য করে গুলি করলাম। বারুদের তীব্র গন্ধ চারপাশে ছড়িয়ে পড়ল, ধোঁয়ায় কিছুই দেখা যাচ্ছে না।

গুলি খেয়ে একটা না-মানুষ ভারসাম্য হারিয়ে রেলিংয়ের ওপর দিয়ে তিনতলা থেকে আমার গায়ের ওপর এসে পড়ল। সেই ধাক্কায় আমার হাতের মুঠো থেকে মিসেস মজুমদার ফসকে গেলেন। মাথায় বেশ জোরে আঘাত লেগেছে। ক্লেদাক্ত লাশটাকে কোনোমতে ঠেলে সরালাম, কিন্তু ততক্ষণে বেশ দেরি হয়ে গিয়েছে। একটা না-মানুষ মিসেস মজুমদারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে দাঁত বসিয়ে দিল তাঁর গলায়। একটানে ছিঁড়ে ফেলল কণ্ঠনালি।

বৃদ্ধার গলা থেকে ফিনকি দিয়ে ছুটে আসা রক্তের কিছুটা আমার মুখে পড়ল। "নিজেকে বাঁচাও।" কে যেন বলে উঠল মনের ভেতর। শেষবারের মতো তাকালাম মিসেস মজুমদারের দিকে। না-মানুষগুলো ঘিরে ধরছে তাঁকে। কয়েকটা তো মেঝে থেকে রক্ত চেটে খাওয়া শুরু করে দিয়েছে। বৃদ্ধার চোখ উলটে গিয়েছে, থরথর করে কাঁপছে দেহ। রক্তের বন্যা বয়ে যাচ্ছে। ওদের একজন বৃদ্ধার হাত কামড়ে ধরেছিল। আমাকে সামনে পেয়ে হাত ছেড়ে দাঁত বের করে দেহগুলোর ভিড়ের মধ্য থেকে বের হয়ে এলো। কামড়াবে আমাকে!

পিস্তলে কোনো গুলি অবশিষ্ট নেই। কিন্তু তাই বলে অস্ত্র হিসেবে একেবারে অকেজো হয়ে যায়নি সেটা। না-মানুষটা নাগালের ভেতর আসতেই পিস্তলের বাঁট দিয়ে ঘুরিয়ে আঘাতে করলাম ওটার মাথায়। তরমুজ ফাটার মতো শব্দ হলো। ফাটা মাথা থেকে নির্গত হওয়া সাদা তরলের কিছুটা লেপ্টে গেল পিস্তলের বাঁটে।

ওটার ওপর থেকে নজর সরাবারও সময় পেলাম না, ডান কাঁধটাতে যেন কেউ আগুন ধরিয়ে দিল। ওপর থেকে নেমে আসা অবশিষ্ট না-মানুষটা অতর্কিতে পেছন থেকে কাঁধ কামড়ে ধরেছে।

পেছন দিকে ছুড়ে দিলাম নিজেকে। রেলিংয়ের সাথে জোরে ধাক্কা খাবার সাথে সাথে না-মানুষটা কামড় ছেড়ে দিল। এক বিন্দু সময় নষ্ট না করে ঘুরে ওটারও মাথায় পিস্তলের বাঁট দিয়ে মারলাম। হ্যাঁচকা টান দিয়ে ওটাকে ফেলে দিলাম নিচে, অন্যগুলোর ওপর।

মাত্র কয়েক সেকেন্ড লাগল ছুটে নিজের ফ্ল্যাটে প্রবেশ করতে। ক্ষিপ্তগতিতে দরজা বন্ধ করে লক করে দিলাম। কাঁধ থেকে প্রচুর রক্ত পড়ছে। শরীরের ডান দিক এরই মধ্যে রক্তে মাখামাখি।

বাতি নিভিয়ে দরজার পাশে দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসলাম। প্রচণ্ড ক্লান্ত বোধ হচ্ছে! মনে হচ্ছে জ্ঞান হারাব। দরজার বন্ধ হওয়া সত্ত্বেও সিঁড়িঘর থেকে মাংস ছেঁড়ার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। দরজায় আঘাত করল ওরা কয়েকবার। কিন্তু চিন্তা নেই, ওরা ভেতরে আসতে পারবে না। এই মুহূর্তে আমি নিরাপদ, ভাবনাটা আমার মাথায় ঘুরপাক খেল কয়েকবার। তারপরই আমি জ্ঞান হারালাম।

॥তিন॥

সারা বিশ্বে রোগটির আবির্ভাব প্রথম ঘটে আজ থেকে এক বছর আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। কিভাবে রোগের জীবাণু সৃষ্টি হয়েছিল, তার সঠিক উৎপত্তিস্থল কি সে

সম্পর্কে আজও কেউ পরিষ্কার ধারণা দিতে সক্ষম হয়নি। তবে আন্দাজ করা গিয়েছে, জীবাণু দক্ষিণ আমেরিকার কোনো ল্যাবরেটরিতে অত্যন্ত গোপনীয়তার সাথে কৃত্রিমভাবে সৃষ্টি করা হয়েছিল।

"দ্যা হ্যারল্ড" এ প্রতিবেদন ছেপেছিল– জীবাণুটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তৈরি করেছিল রাসায়নিক অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করার জন্য। প্রাথমিক পর্যায়ে, জীবাণুটা গণহারে মানুষ হত্যা করতে সক্ষম ছিল। তারপর অন্তর্ঘাত হোক বা যাই হোক, খুব সম্ভবত জীবাণুর মৌলিক গঠনে কিছু সূক্ষ্ম পরিবর্তন আনায় মানবদেহের ওপর সেটার প্রভাবও আমূল বদলে যায়। সৃষ্টি হয় সমগ্র মানবজাতির জন্য এক ভয়াবহ অভিশাপ, যাকে সংবাদমাধ্যম নাম দেয় 'হেডিস'-মৃত্যুর দেবতা।

চরম নির্বুদ্ধিতার উৎকৃষ্ট উদাহরণ দেয়া যায় মাত্র একটি ঘটনা দিয়ে। মার্কিন বিজ্ঞানীরা 'হেডিস' সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিল, কিন্তু সেটার সঠিক কোনো প্রতিষেধক তারা তৈরি করতে পারেনি এবং ফলাফল হলো ভয়ানক। সামান্য একটা দুর্ঘটনার কারণে সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রে জীবাণুটা ছড়িয়ে পড়ল। ওই প্রজেক্টে কর্মরত এক বিজ্ঞানীই বোধহয় সর্বপ্রথম হেডিস রোগে আক্রান্ত হয়। যতক্ষণে ব্যাপারটা ধরা পড়ল, ততক্ষণে খুব বেশি দেরি হয়ে গিয়েছে। নিরোধন ব্যর্থ হলো। জীবাণুর বাহক বায়ু হওয়ায় তা খুব দ্রুত সর্বত্র বিস্তার লাভ করে।

কোনো বিচিত্র কারণে হেডিস সবাইকে আক্রান্ত করতে পারে না। কারও কারও দেহ পুরোপুরিভাবে হেডিসকে প্রতিরোধ করতে পারে। যতদূর জানা গিয়েছে, সারা বিশ্বের বিজ্ঞানীরা হাতেগোনা সেসব মানুষের ওপর প্রচুর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছেন। কিন্তু এখনো কোনো সুরাহা পাওয়া যায়নি।

হেডিস বাতাসে থাকা অবস্থায় নিষ্ক্রিয় থাকে। মানবদেহে প্রবেশের পরও সেটা অনেক দিন নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকতে পারে। অনেকটা এইডসের মতো। তারপর অনুকূল পরিস্থিতিতে হঠাৎ সেটা আক্রমণ করে দেহকে। তারপর ধীরে ধীরে মস্তিষ্ককে।

হেডিসে আক্রান্ত রোগীরা চারটি ধাপের মধ্যে দিয়ে যায়। প্রাথমিক অবস্থায় ক্ষুধা কমে যায়। বেশ জ্বর ওঠে এবং প্লীহা ফুলে যায়। দ্বিতীয় ধাপে জ্বর সেরে গিয়ে রোগী আপাতদৃষ্টিতে সেরে ওঠে, কিন্তু সারাদেহে বিচ্ছিন্নভাবে চাকা চাকা খয়েরি বর্ণের ছোপ ফুটে ওঠে। তৃতীয় ধাপে হেডিস মস্তিষ্ক আক্রান্ত করা শুরু করে। তখন রোগীর দৃষ্টিভ্রম হয়, চিন্তাধারায় আমূল পরিবর্তন দেখা দেয়। চিত্তভ্রংশ হয়।

চতুর্থ এবং সর্বশেষ ধাপে রোগী সারাদেহে অসহনীয় ব্যথা অনুভব করে। প্রচুর মাত্রায় অভ্যন্তরীণ রক্তক্ষরণ হয় এবং মারাত্মক খিঁচুনি দিয়ে একসময় মৃত্যু ঘটে। তারপর কমবেশি দশ থেকে ষোল ঘণ্টার মধ্যে মৃতের মস্তিষ্ক হেডিস পুনর্জীবিত করে তোলে এবং দেহের স্বাভাবিক কার্যক্রম আবারও শুরু হয়ে যায়।

মস্তিষ্ক পুনর্জীবিত হলেও মানবিক এবং ব্যক্তিসত্তার সকল চিহ্ন মুছে যায়। কেবল থেকে যায় আদিম একটি চাহিদা– ক্ষুধা। "দ্যা ডিজায়ার টু ফিড অন লিভিং ফ্লেশ"– এভাবেই হেডলাইন দিয়ে "টাইম" একটা সংখ্যা বের করেছিল। "টাইম"ই সর্বপ্রথম পুনর্জীবিত এসব লাশের নামকরণ করে "দ্যা নন-হিউমেন্স"– না-মানুষ।

হেডিস মস্তিষ্কের কার্যক্রম নানাভাবে বদলে ফেলে। না-মানুষদের মধ্যে ক্ষুধা আর বিশ্রাম ছাড়া কোনো চাহিদা থাকে না। তাদের মধ্যে সামান্য করে হলেও আদিম কিছু প্রবৃত্তি কাজ করে। সূর্যের আলো ওরা কিছুতেই সহ্য করতে পারে না। তাই দিনের বেলা যে যেখানে পারে লুকিয়ে থাকে।

কুষ্ঠরোগের সাথে হেডিসের এক দিক থেকে মিল আছে– মৃতদেহ পুনর্জীবিত হবার পর দেহের অনেক অংশের স্নায়ু পুরোপুরি নষ্ট হয়ে যায়। কুষ্ঠ রোগীর মতোই দেহের প্রান্তের অংশগুলো অল্প আঘাতেই ফেটে যায়, ঘা সৃষ্টি হয় এবং একসময় দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। প্রথমেই নাক, কান, আঙুল বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় দেহ থেকে। তাদের দেহের অন্য কোনো স্থান আঘাতপ্রাপ্ত হলে দ্রুত পচে যায়।

স্নায়ুমণ্ডল অনেকাংশে নষ্ট হয়ে যাওয়ায় না-মানুষেরা ব্যথা খুব একটা অনুভব করে না। আরও লক্ষ্য করা হয়েছে যে কোনো এক বিচিত্র কারণে না-মানুষেরা কখনো একে-অপরকে আক্রমণ করে না। আদিম প্রবৃত্তি কাজ করায় তারা বেশিরভাগ সময়ই সংঘবদ্ধ হয়ে ঘোরে শিকারের খোঁজে। সেই সংঘবদ্ধ দল তখন একত্র হয়ে কাজ করে একটি একক সত্তা হিসেবে।

হেডিস নানা দেশে অল্প সময়ের মধ্যে ছড়িয়ে পড়লে বেশিরভাগ দেশই সকল আগমন এবং প্রস্থানের পথ বন্ধ করে দেয়। দেশের সীমানায় বসানো হয় কঠিন পাহারা। সকল আমদানি-রপ্তানি সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দেয়া হয়। তারপরও শেষ রক্ষা হয়নি। হেডিস প্রলয়ঙ্করী এক ঢেউয়ের মতো ছড়িয়ে গেল সারা বিশ্বে।

এখন একটাই প্রশ্ন– মানবজাতি কি টিকে থাকতে পারবে? প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ হেডিসে আক্রান্ত হয়ে মারা যাচ্ছে। ফিরে আসছে না-মানুষ হয়ে। তারপর হত্যা করছে স্বাভাবিক মানুষদেরকে, খাদ্যের উৎস হিসেবে। এই প্রক্রিয়া কি মানবজাতিকে বিলুপ্তির দিকে নিয়ে যাচ্ছে?

একটি যুদ্ধ শুরু হয়েছে, যার পাল্লা না-মানুষদের দিকে বেশি ঝুঁকে আছে। কিন্তু তারপরও স্বাভাবিক মানুষেরা চেষ্টা করছে টিকে থাকতে। চেষ্টা করছে, পাল্লার সমতা কিছুটা হলেও ফিরিয়ে আনতে। নানা জায়গায় হেডিস আক্রান্তদের হত্যা করা হচ্ছে তাৎক্ষণিকভাবে। বিভিন্ন উপায়ে ধ্বংস করে দেয়া হচ্ছে মস্তিষ্ক, যাতে লাশ পুনর্জীবিত না হতে পারে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে হেডিস আক্রান্ত রোগীর মৃত্যুর পরপরই দেহ আগুনে পুড়িয়ে ফেলা হচ্ছে।

এই পরিস্থিতি থেকে নিস্তার পাবার কোনো পথ আছে কি নেই তা কারও জানা নেই। সবার কাছে এখন একটিমাত্র জিনিসই বাকি আছে– আশা! এখনো আশা করা যায়, হয়তো যে সকল বিজ্ঞানী দিনরাত আপ্রাণ কাজ করে যাচ্ছেন, তারা হয়তো হেডিসের প্রতিষেধক তৈরি করতে পারবেন। হয়তোবা.....

॥চার॥

আমার জ্ঞান ফিরল সকালবেলায়। জানালার পর্দার ফাঁক দিয়ে এক চিলতে রোদ ড্রাইংরুমের কার্পেটের ওপর পড়েছে। ঘরের মাঝখানে চেয়ার উল্টে পড়ে আছে, চারদিকে ভাঙা গ্লাসের টুকরো।

সাবধানে মেঝে থেকে উঠে বসলাম। মাথা এখনো ব্যথা করছে। সারা রাতই বোধহয় কাঁধের ক্ষত থেকে রক্ত চুইয়ে চুইয়ে পড়েছে। কালচে হয়ে জমে আছে মেঝের ওপর। বাম আঙুল দিয়ে ক্ষত স্পর্শ করলাম। টনটনে ব্যথা আছে, কিন্তু রক্ত শুকিয়ে গিয়েছে। ডান হাতও নাড়াতে পারছি। পায়ের কাছ থেকে পিস্তল কুড়িয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। দ্রুত মনে মনে কিছু হিসাব কষলাম। হাতে একদমই সময় নেই।

বাথরুমে ঢুকে আয়োডিন দিয়ে ক্ষতস্থানটা ধুয়ে ব্যান্ডেজ করে নিতে বেশি সময় লাগল না। গত রাতের ঘটনা আমার মনে বেশ ভালোভাবেই নাড়া দিয়েছে। জানি, আমার হাত থেকে সময় বালুর মতো বয়ে বের হয়ে যাচ্ছে। হেডিসের তৃতীয় ধাপে পৌঁছাবার আগেই এখান থেকে বের হয়ে যেতে হবে। এই চার দেয়ালের মধ্যে বন্দি অবস্থায় আমি মারা যেতে রাজি নই। কোনোমতেই এটা হতে দেব না।

অল্প কিছু খাবার খেয়ে নিয়ে একটা ব্যাগে কয়েকটা কাপড় আর শুকনো খাবার ভরে নিলাম। পিস্তলে গুলি ভরে, গুলির বাক্সটা ব্যাগে ঢুকিয়ে দৃঢ় পায়ে সদর দরজা খুলে একতলায় নেমে এলাম। ফ্ল্যাটের দরজা হাঁ হয়ে খোলা থাকল– থাক খোলা, আমি তো আর ফিরে যাচ্ছি না সেখানে। দরজা খোলা থাকলেই কি বা না থাকলেই কি!

একতলার সিঁড়ির কোণায় মিসেস মজুমদারের ছিন্নভিন্ন লাশ পড়ে আছে। খোলা চোখ নিষ্পলক চেয়ে আছে ওপরের দিকে। মুখের ওপর মাছি ভনভন করে উড়ছে। একটা হাত বিচ্ছিন্ন অবস্থায় পড়ে আছে গেটের বাইরে; একটা নেড়ি কুকুর সেটা নিয়ে টানাটানি করছে দেখে হুঁশ হুঁশ করে তেড়ে গেলাম। নেড়িটা বোধহয় এসবে বেশ অভ্যস্ত। হটে তো গেলই না, বরং উল্টো আমাকে উদ্দেশ্য করে দাঁত খিঁচিয়ে ঘেউ ঘেউ করা শুরু করল। না-মানুষগুলোকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না, এরই মধ্যে কোথাও লুকিয়ে পড়েছে তারা। গত রাতে যেগুলোকে মেরেছিলাম, সেগুলোর দেহও সিঁড়িঘরে ছিল না। হয়তোবা ওগুলোকে খেতে ওরা সাথে নিয়ে গিয়েছে।

কি মনে হওয়ায় ব্যাগটা গেটের কাছে ফেলে এক দৌড়ে সিঁড়ি বেয়ে নিজের ফ্ল্যাটে চলে গেলাম। সাদা একটা চাদর নিয়ে ফিরে এসে মিসেস মজুমদারের দেহ আপাদমস্তক ঢেকে দিলাম। তাঁর জন্য এর চেয়ে বেশি কিছু করার ক্ষমতা বা সময়, কোনোটিই আমার নেই।

গ্যারেজ খুলে গাড়ি বের করলাম। ফুয়েল গজ পরীক্ষা করে দেখি তেল যথেষ্ট পরিমাণে আছে, অন্তত আমার গন্তব্যে পৌঁছাবার জন্য যথেষ্ট। আমার গন্তব্য? কুমিল্লা। শহরের বাইরে কিছু দূরে ছোট একটা গ্রামে আমার নানা বাড়ি। জানি না, ওদের কেউ এখনো বেঁচে আছেন কি-না। তবুও, ওখানেই আমাকে যেতে হবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমার নানী এখনো বেঁচে আছেন। তাছাড়া, আমার ছোট ফ্ল্যাটের ভেতর মরে পড়ে থাকার চেয়ে খোলা মাঠে, গ্রামের মাটিতে মারা যাওয়া অনেক ভালো। ঘড়ি দেখলাম। বারোটা বাজতে চলেছে। এখনি রওনা হলে দুটোর মধ্যে পৌঁছে যাওয়া যাবে। রাস্তাঘাট অবশ্য এখন ফাঁকা, বেশ জোরেই চালানো যাবে; কিন্তু আমি কখনোই গাড়ির গতি একশোর ওপরে তুলিনি। আজও তুলব না। আমার

তাড়া আছে ঠিকই, কিন্তু অতটা তাড়া নেই যে ঝড়ের গতিতে গাড়ি চালিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

গাড়ি চালিয়ে বাসার সামনে দিয়ে যাবার সময় আবার চোখ চলে গেল চাদরে মোড়া মিসেস মজুমদারের লাশের দিকে। নেড়ি কুকুরটাকে দেখা যাচ্ছে না। তবে সেটা বোধহয় চাদর কামড়ে ধরে টানাটানি করেছিল, কারণ বৃদ্ধার মুখের ওপর থেকে চাদর সরে গিয়েছে। নিজের অজান্তে বুকের গভীর থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস বের হয়ে এলো। গত রাতের বোকামির জন্য তাঁকে দোষ দেয়া যাবে না। ইদানীং শরীরে আমার মতো ছোপওয়ালা কাউকে দেখলেই জড়ো হয়ে গণপিটুনি দিয়ে, নয়তো অন্য কোনো পন্থায় হত্যা করতেও বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ করে না লোকজন।

সে জন্যই গায়ে ফুলহাতা শার্ট পরে নিয়েছি। কুমিল্লায় অক্ষত পৌঁছতে চাই। অহেতুক ঝুঁকি নেবার কোনো মানে হয় না। হেডিস রোগে আক্রান্ত একজনকে আমি মালিবাগে গণপিটুনিতে মারা যেতে দেখেছি। সৌম্যদর্শন এক ভদ্রলোক। বয়স ষাট-পঁয়ষট্টির কোঠায় হবে। কিভাবে যেন আশপাশের লোকজনের নজরে আসে যে তার গায়ের চামড়ায় খয়েরি ছোপ। সাথে সাথে শ'খানেক লোক জড়ো হয়ে গেল সেখানে। যে যেভাবে পারে মারা শুরু করে তাকে। ইট, বাঁশ, রড দিয়ে ক্রমাগত আঘাত করতে করতে লোকটাকে হত্যা করা হয়। দূরে দাঁড়িয়ে পুরো ঘটনাটাই দেখেছি। প্রতিবাদ করতে চেয়েও সাহস পাইনি। 'মব সাইকোলজি' খুব ভয়ঙ্কর একটা জিনিস, দল বেঁধে মানুষ সবকিছুই করতে পারে। এ ঘটনা থেকে ধারণা করা যেতে পারে যে আমি খুব ভীতু একজন মানুষ। কিন্তু না, আমি ভীতু নই। আমি স্বার্থপর।

জোরে গান ছেড়ে দিলাম, ম্যাডোনার 'ফ্রোজেন'। অনেক দিনের পুরনো সিডি। সিডি প্লেয়ারে ধুলো জমার কারণে গান স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে না। বিরক্তিকর ক্যাচ ক্যাচ শব্দ হচ্ছে থেকে থেকে। তারপরও শুনছি। আর গান শোনার সময় কি আমার হবে?

রাস্তাঘাট সত্যিই ফাঁকা। ইতস্তত দু'একটা রিকশা দেখেছি। চালক ও আরোহী, দু'জনেরই মুখে ভয় এবং উৎকণ্ঠার ছাপ স্পষ্ট। একজন চাচ্ছে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নিরাপদে গন্তব্যে পৌঁছতে, আরেকজন চাচ্ছে যাত্রীকে গন্তব্যে পৌঁছে দিয়ে টাকা নিয়ে দ্রুত সরে পড়তে।

হাইওয়েতে উঠে গাড়ির গতি বাড়িয়ে দিলাম। মনের বোঝা একটু যেন হালকা হয়ে গেল। জানালা নামিয়ে দিয়ে গানের ভলিউম বাড়িয়ে দিলাম। বাতাসে চুল উড়ছে। আহ্, বেঁচে থাকার কি আনন্দ! হঠাৎ খুব আফসোস হলো। ইস্ আরও যদি সময় পেতাম! ছ'মাস? দু'মাস? অন্তত এক মাস হলেও চলত। জীবনের যতগুলো সাধ অপূর্ণ রয়ে গিয়েছে, সবগুলো মনে পড়ে গেল একে একে। কত কিছু করা বাকি ছিল!

হাইওয়ের ওপর কয়েক কিলোমিটার পরপর পরিত্যক্ত, বিকল হয়ে যাওয়া, কিংবা দুর্ঘটনার শিকার ভেঙে দুমড়েমুচড়ে যাওয়া যানবাহন চোখে পড়ছিল। একটা বাস তো কাত হয়ে পুরো রাস্তা জুড়ে আড়াআড়ি পড়ে ছিল। খুব সাবধানে রাস্তার কোণা দিয়ে চালিয়ে জায়গাটা পার হতে হয়েছে। একটু এদিক-সেদিক হয়ে চাকা পিছলে গেলে সোজা বিশ ফুট নিচে পানিতে পড়তে হতো।

মাধাইয়ার কাছে পৌঁছতেই বড় একটা দুর্ঘটনার হাত থেকে অল্পের জন্য বেঁচে গেলাম। মাধাইয়ার বাজারের কাছেই ঘটল ঘটনাটা। একনাগাড়ে ঘণ্টাখানেক গাড়ি চালানোর ফলে বেজায় তেষ্টা পেয়েছিল। ড্রাইভিং করা অবস্থাতে রাস্তা থেকে চোখ সরিয়ে পাশে সিটের ওপর রাখা ব্যাগ থেকে ছোট একটা পানির বোতল বের করতে যাচ্ছিলাম, তখনি নারীকণ্ঠের চিৎকার শুনে চমকে সামনে তাকালাম। চলন্ত গাড়ির সামনে রাস্তার ওপর কোথা থেকে এক মহিলা এসে উপস্থিত হয়েছে। মহিলা দু'হাত সামনের দিকে প্রসারিত করে চিৎকার করে বললেন, "থামান! গাড়ি থামান!"

স্টিয়ারিং বাম দিকে ঘুরিয়ে গাড়ি বাঁয়ে বাজারের পাশে স্কুলের মাঠে নামালাম। জোরে ব্রেক কষার ফলে চারদিক ধুলোয় ঢেকে গেল। কাশতে কাশতে গাড়ির দরজা খুলে বের হলাম।

—"পাগল হয়েছেন আপনি?" মহিলাকে উদ্দেশ্য করে হাত তুলে শাসিয়ে বললাম।" এভাবে কেউ গাড়ির সামনে এসে দাঁড়ায়? আরেকটু হলেই তো চাপা দিয়ে দিতাম আপনাকে। মাথা কি পুরোপুরি নষ্ট হয়ে গিয়েছে আপনার?"

মহিলা হাত জোড় করে ধীর পায়ে সামনে এগিয়ে এসে কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন, "আমাকে একটু সাহায্য করতে পারবেন? আমার অনেক বিপদ। সাহায্য করবেন ভাই?"

এবার তার দিকে ভালোভাবে তাকালাম। মহিলা নয়, কিশোরী। উনিশ-বিশ বছর বয়স হবে। মুখ অনাহারক্লিষ্ট। পরনের শাড়ি ধুলোয় মলিন হয়ে গিয়েছে। চোখের দৃষ্টিতে মরিয়া ভাব। মেয়েটি সামনের দিকে হঠাৎ ঝুঁকে গেল। ছুটে গিয়ে তাকে না ধরে ফেললে সে মাটিতে পড়ে যেত।

—"মাফ করবেন ভাই।" মেয়েটা ক্ষীণকণ্ঠে বলল, "তিনদিন ধরে কিছু খাইনি।"

মেয়েটিকে গাড়ির সামনের চাকার পাশে হেলান দিয়ে বসিয়ে দরজা খুলে ব্যাগ থেকে পানির বোতল আর এক প্যাকেট বিস্কিট বের করলাম। মেয়েটিকে প্যাকেটটা দিতেই সে বুভুক্ষুর মতো প্যাকেট ছিঁড়ে বেশ কয়েকটা বিস্কিট একসাথে মুখে দিল।

—"আস্তে আস্তে খান" আমি উপদেশ দিলাম, "গলায় আটকে যাবে নয়তো।"

মেয়েটি আমার কথামতো সময় নিয়ে অল্প অল্প করে পানির সাথে বিস্কিট সুস্থির হয়ে খেল। লক্ষ্য করলাম তার রক্তশূন্য চেহারায় রঙ ফিরে এসেছে।

—"আপনাকে অনেক ধন্যবাদ ভাই।" মেয়েটা পানির বোতল আর প্যাকেট ফিরিয়ে দিয়ে বলল।

—"এবার বলুন তো কি হয়েছে? একটু আগে যা করেছিলেন, তা তো রীতিমতো বিপজ্জনক ছিল। ধরুন আমি যদি সময়মতো গাড়ি না ঘোরাতে পারতাম? সোজা গাড়ির নিচে চাপা পড়তেন।"

—"আমার মাথা ঠিক ছিল না ভাই।" মেয়েটা মাথা নিচু করে ফেলল। "আমার যে কত বড় বিপদ বলে, বোঝাতে পারব না।"

—"বলুন আমাকে।" গলার স্বর যথাসম্ভব নরম করে বললাম। "দেখি আপনাকে সাহায্য করতে পারি কি-না।"

মেয়েটি এরপর আমাকে যা বলল তা সংক্ষেপে হলো এই– সে মাধাইয়ার বাসিন্দা। নাম ফারিয়া। গত বছর ঢাকার কলেজে ভর্তি হয়েছিল। গণ্ডগোল শুরু হবার পর সে গ্রামে ফিরে আসে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত পরিবারের সবাই হেডিসে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়– কেবল তার ছ'বছরের ছোট ভাই ছাড়া। সৌভাগ্যবশত তার পরিবারের সদস্যরা কেউই না-মানুষ হয়ে ফিরে আসেনি– গ্রামবাসীরা ওদের মৃতদেহ অন্য সবার মতো পুড়িয়ে ফেলেছিল। ফারিয়া ও তার ছোট ভাইকে এরপর একঘরে করা হয়। পরিবারের প্রায় সবাই হেডিসে আক্রান্ত হয়ে মারা গিয়েছে, সে আর তার ভাই দেহের জীবাণু বহন করছে না– তার নিশ্চয়তা কি? পাছে তাদের থেকে অন্যদের হতে পারে, সেই ভয়ে ওদেরকে একঘরে করা হয়েছিল।

ঘরে মজুদ চাল-ডাল যা ছিল, তাই রান্না করে কোনোমতে দিন পার করছিল দু'জনে। মজুদ খাবারও একসময় ফুরিয়ে যায়। গ্রামে না-মানুষদের উৎপাতও দিনে দিনে বেড়ে চলছিল। এত বিপর্যয়ের মাঝেও দু'জনে একে-অপরকে অবলম্বন করে বেঁচে ছিল। তিনদিন আগে ফারিয়া ছোট ভাইকে খাইয়ে, রাতে বের হয়েছিল খাবারের সন্ধানে। ভাঙা একটা মুদি দোকান থেকে এক ঝোলা চাল এনে ফিরে দেখে ঘরের বাঁশের দরজা ভাঙা। না-মানুষের কটু গন্ধ চারদিকে। ছোট ভাইটি নেই। ওকে ধরে নিয়ে গিয়েছে ওরা।

গ্রামে মানুষ বলতেও এখন তেমন আর কেউ নেই। অনেকেই হয় না-মানুষের আক্রমণে মারা পড়েছে, নয়তো হেডিসে আক্রান্ত হয়েছে, অথবা স্রেফ গ্রাম ছেড়ে পালিয়েছে। তারপরও যে কয়েকটি পরিবার বাকি আছে, তাদের প্রত্যেকের কাছে হন্যে হয়ে ধর্ণা দিয়েছিল ফারিয়া। কোনো লাভ হয়নি। কেউ সাহায্য করেনি। কেউ তার ভাইয়ের খোঁজ দিতে পারেনি। উল্টো মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।

এই তিনদিন ধরে সে উদ্ভ্রান্তের মতো ঘুরছে ভাইয়ের সন্ধানে। তিনদিনে একটা কুটোও পড়েনি তার মুখে। আজ রাস্তায় গাড়ি আসতে দেখে বাছবিচার না করে রাস্তার মাঝে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল সে, সাহায্য পাবার আশায়।

পুরো ঘটনাটা খুলে বলার পর মেয়েটা ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করল। আমি চিন্তিত মুখে বললাম, "তিন দিন! অনেক সময় পার হয়ে গিয়েছে। আমার কথা শুনে আপনার খারাপ লাগতে পারে, কিন্তু.... আপনাকে বুঝতে হবে। তিন দিন অনেক সময়। আপনার ছোট ভাইয়ের বেঁচে থাকার সম্ভাবনা খুব ক্ষীণ।"

—"না!" ফারিয়া চিৎকার করে মুখ ঢেকে ফেলল। "আপনি মিথ্যা কথা বলছেন।"

মেয়েটিকে নির্মম সত্যের মুখোমুখি করতে আমার খারাপ লাগছিল, কিন্তু কিছুই করার নেই। তাছাড়া ওর বলার ধরন দেখেই বুঝেছি, মেয়েটির অবচেতন মনও বুঝতে পেরেছে যে তার ভাই হয়তো আর বেঁচে নেই। কিন্তু সে নিজে কিছুতেই ব্যাপারটা বিশ্বাস করতে চাচ্ছে না।

—"আমি দুঃখিত ফারিয়া। আমারও পরিবারের সবাই হেডিসে আক্রান্ত হয়ে মারা গিয়েছে। বেঁচে আছি কেবল আমি। স্বজন হারাবার ব্যথা আমি বুঝি। হ্যাঁ, আমি হয়তো আপনাকে বলতে পারতাম, আপনার ভাই এখনো বেঁচে আছে। কিন্তু

মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে আমার কি লাভ? আপনাকে এই কঠিন সত্যের মুখোমুখি একসময় না একসময় হতেই হবে। পৃথিবীটা বদলে গিয়েছে। সবাই যে যাকে নিয়ে ব্যস্ত। বেঁচে থাকতে চেষ্টা করছে সবাই। আপনি আপনার ভাইকে খুঁজতে গিয়ে তিনদিন না খেয়ে ছিলেন। অনাহারে আপনি নিজেই মারা যেতে পারতেন। আমাকে নিষ্ঠুর মনে হতে পারে আপনার। সত্য হলো এই– আপনার ভাই হয়তো আর বেঁচে নেই। কিন্তু আপনাকে তো বেঁচে থাকতে হবে। অন্তত বেঁচে থাকার চেষ্টা তো করতে হবে।"

ফারিয়া আমার কথা শেষ হবার পর বড় বড় চোখে তাকিয়ে রইল। তার চোখে অভিযোগের ছাপ স্পষ্ট। আমার নিজেরও হঠাৎ খারাপ লাগল। এতগুলো শক্ত কথা ওকে না শোনালেও পারতাম। বাচ্চা একটা মেয়ে। মনের ওপর দিয়ে এত বড় একটা ঝড় বয়ে গিয়েছে। ওকে বোঝাতে গিয়ে আবার কোনো ক্ষতি করে বসলাম না তো?

মেয়েটা কথা নেই বার্তা নেই, আবারো ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল। আমি তাকে কাঁদতে দিলাম। কাঁদুক। কেঁদে ভেতরটা একটু হালকা হোক। সত্যিই, কিছুক্ষণ কেঁদে সে শাড়ির আঁচল দিয়ে চোখ মুছে ফেলল। বড় একটা নিঃশ্বাস ফেলে জিজ্ঞেস করল, "এখন তাহলে আমি কি করব?"

আমি জবাব না দিয়ে গাড়ির ভেতর যা-যা খাবার আর পানীয় ছিল, তা একটা পলিথিনের প্যাকেট মুড়ে মেয়েটির হাতে দিলাম।

—"এই নাও। তোমাকে সাহায্য করতে পারিনি বলে আমি খুবই দুঃখিত।" নিজের অজান্তেই আপনি থেকে তুমিতে নেমে গিয়েছি। "যাবার আগে আমার সাথের সব খাবার তোমাকে দিয়ে যাচ্ছি। অন্তত কিছুদিন পার করতে পারবে এসব খেয়ে।"

—"আপনি চলে যাচ্ছেন?" ফারিয়া বিস্ময়মাখা চোখে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল।

—"হ্যাঁ, আমার পক্ষে এখানে আর বেশিক্ষণ থাকা সম্ভব নয়। আমার হাতে সময় বেশি নেই। তোমার ভাইয়ের ব্যাপারে আমি সত্যিই দুঃখিত ফারিয়া। তবে..." আমি ইতস্তত করে বললাম, "তুমি চাইলে আমার সাথে আসতে পারো।"

—"আপনার সাথে? কোথায়?" ফারিয়া চমকে পিছিয়ে গেল, তার চোখে সন্দেহের ছায়া।

আমি এবার লজ্জিতভাবে হাসলাম। সত্যিই তো। একজন পুরুষমানুষ কমবয়সি একটি মেয়েকে সাথে আসতে আহ্বান করছে– ভয় পাওয়াটাই স্বাভাবিক। বিব্রত কণ্ঠে তাকে বোঝালাম, "ভয় পেও না। তোমাকে একলা এখানে ফেলে যেতে ইচ্ছে হচ্ছিল না বলেই কথাটা বলেছি। তুমি অন্য কিছু মনে করো না। যাই হোক, আমি যাচ্ছি। সাবধানে থাকবে, ঠিকমতো খাওয়া-দাওয়া করবে। বিদায়।"

মেয়েটি কোনো জবাব না দিয়ে কঠিন চোখে চেয়ে রইল। আমি মাথা ঝাঁকিয়ে গাড়িতে উঠে বসলাম। গাড়ির ইঞ্জিন চালু করার সাথে সাথে আমাকে অবাক করে মেয়েটা ছুটে এলো।

—"ভাইয়া, থামুন। আমি যাব আপনার সাথে। এখান থেকে নিয়ে চলুন আমাকে।"

শুকনো হাসি হাসলাম, "হঠাৎ মত পরিবর্তন করলে যে?"

ফারিয়া গাড়ির পেছনে বসে খাবারে ব্যাগটা সযত্নে পায়ের কাছে রেখে দিল। তারপর জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে বলল, "আপনি যা বলেছেন, তা সবই হয়তো সত্যি। রাজু– আমার ভাই– হয়তো সে সত্যিই বেঁচে নেই। এটাও সত্যি– আমি এখন যাবে কোথায়? খোদা জানেন, আপনাকে আমার ভালো মানুষ বলে মনে হয়েছে। আমার মন বলছে আমি আপনাকে বিশ্বাস করতে পারি, আমার কোনো ক্ষতি আপনি করবেন না। সত্যিই কি তাই ভাইয়া? সত্যিই আপনি আমাকে সাথে নিয়ে যাবেন? সত্যিই কি পারবেন আপনার এই অসহায় বোনটিকে রক্ষা করতে?"

আমি তার কথায় বাধা দিলাম, "তার আগে একটা জিনিস তোমার জেনে রাখা উচিত। এই দেখ!" বলে আমি শার্টের হাতা গুটিয়ে খয়েরি ছোপগুলো দেখালাম। একদিনের ব্যবধানে ওগুলো আরও বিস্তৃত হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে।

ফারিয়ার হাত তার অজান্তে মুখের কাছে উঠে এলো। ধরা গলায় বলল, "আপনিও ওই রোগে আক্রান্ত ভাইয়া?"

—"হ্যাঁ।" সামনের দিকে তাকিয়ে জবাব দিলাম। "এ জন্যই বলেছি, আমার হাতে খুব একটা বেশি সময় নেই। আমি এই মুহূর্তে কুমিল্লায় আমার নানাবাড়ি যাচ্ছি। আমার নানী আছেন ওখানে। জীবনের শেষ মুহূর্ত ওখানেই কাটাব। এবার তুমি বলো, হেডিসে আক্রান্ত রোগীর সাথে তুমি যাবে?"

ফারিয়া হাত বাড়িয়ে শার্টের হাতা সোজা করে দিয়ে উষ্ণ কণ্ঠে বলল, "এই প্রথম একজনকে পেলাম যে আমাকে কিছুটা হলেও সমবেদনা জানিয়েছে, সহমর্মিতা দেখিয়েছে। সাহায্য করতে চেয়েছে। আমি এ রোগকে আর ভয় পাই না। আমার হলে হবে। আমি আপনার সাথে যাব ভাইয়া।"

আমি মুখের হাসি বিস্তৃত করে রওনা দিয়ে দিলাম। গান ছেড়ে ভিউইং মিররে তাকালাম। ফারিয়া পেছনের সিটে হেলান দিয়ে বসে আছে চোখ বন্ধ করে।

—"বাই দা ওয়ে, আমার নাম নাজমুল।"

—"নাজমুল ভাইয়া, আপনার নানাবাড়ি এখান থেকে আর কত দূরে?" ফারিয়া চোখ না খুলে জিজ্ঞেস করল। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল যে সে খুব ক্লান্ত।

—"বেশিক্ষণ লাগবে না। জোরে চালিয়ে নিয়ে গেলে কুমিল্লা শহরে পৌঁছতে বড়জোর আরো পঁয়তাল্লিশ মিনিট লাগবে। তারপর গ্রামে পৌঁছতে আধঘণ্টার ড্রাইভ।"

—"ঠিক আছে ভাইয়া।" বলে ফারিয়া সিটে মাথা এলিয়ে দিল।

আমি মনোযোগ ফেরালাম ড্রাইভিংয়ের দিকে। বেশি জোরে চালানো যাবে বলে মনে হচ্ছে না। রাস্তাঘাটের অবস্থা খুব একটা ভালো নয়। গাড়ি বেশি ঝাঁকালে মেয়েটা ঘুমোতে পারবে না। ঠিক করলাম গ্রামে পৌঁছাবার পর ওকে ঘুম থেকে তুলব। তিন দিন ধরে ভাইকে খুঁজে বেরিয়েছে মেয়েটা। ক্লান্ত থাকাটাই স্বাভাবিক।

॥পাঁচ॥

শহরের ভেতর প্রবেশ করা মাত্র গাড়ি আচমকা থেমে গেল। একেবারে "ফুলস্টপ" দিয়ে থামা যাকে বলে। গাড়ি থেকে নেমে খানিকটা সময় নিয়ে ইঞ্জিন পরীক্ষা করে

দেখলাম। আপাতদৃষ্টিতে কোনো সমস্যাই চোখে পড়ল না। ট্যাঙ্কে তেল পর্যাপ্ত আছে। ব্যাটারিতেও কোনো সমস্যা হয়নি। ইঞ্জিনের সামনে দাঁড়িয়ে মাথা চুলকাচ্ছি। ফারিয়া দরজা খুলে বের হয়ে এলো। তার চোখে এখনও ঘুমের রেশ লেগে আছে।

—"কি হয়েছে ভাইয়া?" লম্বা একটা হাই তুলে সে জিজ্ঞেস করল।

—"ধুৎ, আর বলো না, গাড়ির ইঞ্জিন থেমে গিয়েছে। সমস্যাটা কোথায়, সেটাও ধরতে পারছি না। নিচের ঠোঁট কামড়াতে কামড়াতে চিন্তিত ভঙ্গিতে জবাব দিলাম।

—"ঠেলতে হবে নাকি?" ফারিয়া ইঞ্জিন এক নজর দেখে ভ্রূ কুঁচকে জিজ্ঞেস করল।

—"নাহ্ ব্যাটারি ডাউন হয়নি। ঠেললে কোনো লাভ হবে না। এখন কি করা যায় বলো তা?"

—"আপনার নানাবাড়ি আর কত দূরে?"

—"এখনো বারো কিলোমিটার দূরে। চাচ্ছিলাম বেলা থাকতেই পৌঁছে যেতে। গাড়িটা নষ্ট হয়ে গেল, হেঁটে যেতে তো অনেক সময় লাগবে।"

—"একটা সাইকেল পেলে ভালো হতো, তাই না?" ফারিয়া চারদিকে তাকাল।

—"ব্রিলিয়ান্ট!" আমি খুশি হয়ে ওর তারিফ করলাম। "একটা সাইকেল পেলেই তো সব সমস্যা মিটে যায়। সাইকেলে চড়ে বিকেল হবার আগেই পৌঁছে যাওয়া যাবে। শোনো, তুমি গাড়ির দরজা লক করে বসে থাকো। আমি আসছি। দেখি, কোথাও কোনো সাইকেল খুঁজে পাই কি-না।"

তারপর মনে পড়ে যাওয়ায় ব্যাগ থেকে পিস্তলটা বের করে ওর হাতে দিলাম। ও অস্ত্রটা হাতে নিয়েই আঁতকে উঠল।

—"এটা কি?"

—"পিস্তল। আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত এটা হাতের কাছে রাখ। দরকার পড়তে পারে।"

—"কিন্তু, আমি তো এটা ব্যবহার করতে পারি না", সে প্রতিবাদ জানাল।

—"শেখার কিছুই নেই।" আমি বোঝালাম, "তাক করবে, আর ট্রিগারে চাপ দেবে। যাও, এখন গাড়ির ভেতরে বসো। আমি ঘুরে আসি।"

ওকে বসিয়ে রেখে সাইকেল খুঁজতে বের হলাম। বেশিক্ষণ ঘুরতে হলো না, মেকানিকের খালি একটা দোকানের পেছনে পুরনো একটা সাইকেল খুঁজে পেলাম। চাকায় হাওয়া কম দেখে দোকানের ভেতর একটু খুঁজতেই একটা ছোট হস্তচালিত পাম্প পেয়ে গেলাম।

সাইকেল চালিয়ে ফিরে এসে দেখি ফারিয়া আবারো গাড়ির ভেতর ঘুমিয়ে পড়েছে। পিস্তলটা কোলের ওপর রাখা। মেয়েটা সত্যিই বেশ ক্লান্ত। জানালার কাছে টোকা দিলাম। ফারিয়া লাফ দিয়ে উঠে বসল।

—"সাইকেল পেয়ে গিয়েছি, খাবারে প্যাকেটটা সামনের সিটে রাখা কাপড়ের ব্যাগটাতে ভরে ফেলে সাথে নিয়ে চলে আসো।"

—"আপনার গাড়ির কি হবে?"

—"চুলোয় যাক গাড়ি। এটা এমনিতেই চার-পাঁচদিন পরে আমার আর কোনো কাজে আসবে না। মরার পর গাড়ি নিয়ে আমি করবটা কি?" হেসে জবাব দিলাম।

ফারিয়া পিস্তল ফিরিয়ে দিয়ে ব্যাগ কোলে নিয়ে ক্যারিয়ার সিটে বসল। ঘাড় ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "ক্যারিয়ার সিটে বসতে পারবে তো?" শাড়ি সামলে বসো। খেয়াল রেখো, শাড়ির কোনো অংশ যেন পেছনের চাকায় জড়িয়ে না যায়। গেলেই সর্বনাশ।"

ফারিয়া মুচকি হাসল, "শুধু শুধু চিন্তা করছেন ভাইয়া। আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে সাইকেল চালান। আমি যখন ছোট ছিলাম, বাপজান প্রতিদিন সকালে সাইকেলে করে আমাকে স্কুলে পৌঁছে দিতেন। নিজেও খুব ভালো সাইকেল চালাতে পারি।"

—"গুড।" আমি প্যাডেলে পা দিলাম। সাড়ে তিনটা বাজে। অনেক সময় নষ্ট হয়েছে।

শহরের ভেতর দিয়ে সাইকেল চালিয়ে যাবার সময় লক্ষ্য করলাম– পুরো শহর জনশূন্য। খাঁ-খাঁ করছে। রাস্তার পাশে পড়ে থাকা কিছু মৃতদেহ চোখে পড়ল বটে, কিন্তু সেগুলো অনেক দিনের পুরনো। কুকুর, কাক-পক্ষীতে খেয়ে ছেঁড়া কাপড় আর হাড়গুলোই কেবল রেখে গিয়েছে। খালি বাসাগুলোর পাশ দিয়ে যাবার সময় তাকিয়ে ভাবলাম, এগুলোর ভেতরেই কি না-মানুষগুলো লুকিয়ে আছে? রাত হলেই বের হয়ে আসবে তাজা মাংসের সন্ধানে?

ফারিয়া সাইকেলে চড়ে বেশ মজা পাচ্ছে বলে মনে হলো। একবার আড়চোখে পেছনে তাকিয়ে দেখি চোখ বড় বড় করে আশপাশের সব দৃশ্য দেখছে সে। মাথা থেকে শাড়ি খসে পড়ায় তার লম্বা চুল বাতাসে উড়ছে।

উচু-নিচু রাস্তায় সাইকেল কিছুক্ষণ পরপর লাফিয়ে উঠছিল। তারপরও বেশ জোরে চালাচ্ছি। আমার মাথায় একটাই চিন্তা– আঁধার নেমে আসার আগে নানাবাড়ি পৌঁছাতে হবে। আকাশের অবস্থা আজও খুব একটা ভালো মনে হচ্ছে না। কালকের মতো আজও আকাশে কালো মেঘের আনাগোনা। বৃষ্টির আলামত। আরও জোরে প্যাডেল করতে লাগলাম।

—"এত জোরে চালাচ্ছেন কেন ভাইয়া?" ফারিয়া হাওয়া ছাপিয়ে চিৎকার করে জিজ্ঞেস করল।

—"যত দ্রুত পারা যায় পৌঁছতে হবে।" আমিও চেঁচিয়ে জবাব দিলাম। "আকাশে মেঘ জমেছে। বৃষ্টি হতে পারে।"

—"আপনি বৃষ্টির ভয়ে এত জোরে চালাচ্ছেন? বৃষ্টি নামলে আমরা বরং রাস্তার পাশে কোনো দোকানে ঢুকে আশ্রয় নেব।"

—"বৃষ্টিকে নয়, অন্ধকারকে ভয় পাচ্ছি। তুমি তো দেখেছ, না-মানুষগুলো আঁধার হলে বের হয়ে আসে। মেঘের কারণে আলো কমে আসবে, ওরা তখন সুযোগ পেয়ে বের হতে পারে। এ রিস্কটা আমি নিতে চাচ্ছি না।"

—"বুঝেছি।" ফারিয়া দৃঢ় কণ্ঠে বলল, "আপনি জোরে চালান। আমি শক্ত করে ধরে বসেছি। কিন্তু ভাইয়া, সাবধানে চালাবেন।"

আমি মাথা নেড়ে সায় দিয়ে সাইকেল প্রায় উড়িয়ে নিয়ে চললাম।

শহর শেষ হয়ে হাইওয়ের পাশ দিয়ে গ্রামের পথে নামার সাথে সাথে আশপাশের দৃশ্যপট সম্পূর্ণ বদলে গেল। দু'পাশে আবাদি মাঠ ধুধু করছে। কত দিন ধান বোনা হয় না কে জানে? মাটি ফেটে চৌচির হয়ে গিয়েছে। দূরে গাছপালার ফাঁকে টিনের বাড়িঘর দেখা যাচ্ছে। কিন্তু সেখানে জনমানুষের কোনো উপস্থিতি আমার দৃষ্টিগোচর হলো না।

হাতের ডান দিকের মাঠে একটা মরা গরু দেখলাম। বেশিদিনের পুরনো মরা বলে মনে হলো না। পচে ফুলে আছে। কয়েকটা শকুন ঠোকরাচ্ছে অলস ভঙ্গিতে। পাশ দিয়ে যাবার সময় ভক করে নাকে দুর্গন্ধ এসে আঘাত করল। দেখলাম, ফারিয়াও নাকে আঁচল চাপা দিয়েছে।

সাইকেলের গতি কমিয়ে আনলাম, প্রচুর ধুলো উড়ছে চারদিকে। এ অবস্থায় যত বেশি জোরে চালাব ততই বেশি ধুলো উড়বে। গ্রামের পথগুলোর এটাই প্রধান সমস্যা।

নানাবাড়ি পৌঁছাতে যখন আর ঠিক দশ মিনিটের পথ বাকি, তখনি প্রবল বর্ষণ শুরু হলো। নিমেষে আমি আর ফারিয়া একদম ভিজে একাকার। কোথাও সাইকেল থামিয়ে আশ্রয় নেবারও সময় পেলাম না।

—"ফারিয়া, কোথাও থামব নাকি?" ঠাণ্ডায় হি-হি করে কাঁপতে কাঁপতে বললাম। বৃষ্টির পানি বরফের মতো ঠাণ্ডা। হাড় পর্যন্ত কাঁপিয়ে দিচ্ছে।

—"আপনার নানাবাড়ি আর কত দূর?" ফারিয়া চোখের ওপর থেকে ভেজা চুল সরিয়ে জিজ্ঞেস করল।

—"এই এসে গিয়েছি। বড়জোর কমবেশি আরও মিনিট দশেক লাগবে।"

—"তাহলে থেমে লাভ নেই ভাইয়া। যা ভেজার তা তো ভিজেই গিয়েছি। আপনি চালিয়ে যান।" ফারিয়া ব্যাগটা গায়ের সাথে জাপ্টে ধরে মন্তব্য করল।

প্রায় তিন বছর হলো নানাবাড়ি আসিনি। তারপরও পথ চিনতে ভুল হলো না। মেঠো পথ ছেড়ে সাইকেল ধান ক্ষেতের পাশ দিয়ে চলে যাওয়া সরু রাস্তার ওপর তুলে দিলাম। সাইকেলে করে আসাটা সত্যিই বুদ্ধিমানের কাজ হয়েছে। গাড়ি নিয়ে এখানে আসাটা সম্ভব হতো না। গাড়ি আনলে চাকা কাদায় আটকে যেত।

গাছপালা ঘেরা নানাবাড়ির ভিটায় প্রবেশ করার সাথে সাথে বৃষ্টি কিছুটা কমে এলো। সাইকেল থেকে নেমে ছুটে গেলাম সামনের চিরপরিচিত একতলা টিনের চালের মাটির বাড়িটির দিকে। পেছনে ব্যাগ হাতে ফারিয়া।

বাড়ির দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। তার মানে ভেতরে কেউ আছে। বন্ধ দরজার ওপর সজোরে কড়াঘাত করলাম।

—"কেউ আছেন? দরজা খুলুন। আমি নাজমুল। নানু, বজলু, বিচ্ছু! কেউ আছ নাকি?"

কিছুক্ষণ পর দরজার ওপাশ থেকে রিনরিনে কণ্ঠস্বর ভেসে এলো, "কে? কে আপনে?"

—"বিচ্ছু নাকি? আমি তোর নাজমুল মামা।" বৃষ্টির শব্দ ছাপিয়ে চেঁচিয়ে বললাম, "তাড়াতাড়ি দরজা খোল। কতক্ষণ বাইরে দাঁড়িয়ে বৃষ্টিতে ভিজব।"

—"নাজমুল মামা? আপনে? এতদিন পর? দাঁড়ান, দরজা খুলছি।"

কাঠ সরাবার ভারি শব্দ হলো। আমিও হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। বিচ্ছু শেষ আমাকে দেখেছিল তিন বছর আগে। ভাগ্য ভালো বলতে হবে যে, এতদিন পরও চিনতে পেরেছে।

বিচ্ছু দরজা খুলে আমাকে দেখে মহা হৈচৈ শুরু করে দিল। "মামা! আসলেন শেষ পর্যন্ত! এতদিন পার আমরার কথা মনে পড়ল?"

তারপর তার নজর পড়ল ফারিয়ার ওপর। একগাল হেসে বলল, "ওমা, এইডা কে? মামা, উনি কি আমরার মামানি নাকি?"

—"ধুৎ, বিচ্ছু, কি সব যা তা বলছিস। ও আমার বোনের মতো হয়। ওর নাম ফারিয়া।" ঘুরে ফারিয়ার দিকে তাকিয়ে লজ্জিত ভঙ্গিতে হাসলাম। "ছোট মানুষ তো। হুট করে বলে ফেলেছে। তুমি কিছু মনে করো না।"

ফারিয়া মিষ্টি হেসে বিচ্ছুর মাথার চুল এলোমেলো করে দিয়ে বলল, "আমি কিছুই মনে করিনি। যেমন নামে বিচ্ছু, মনে হচ্ছে কাজেকর্মেও বিচ্ছু। তো মিস্টার বিচ্ছু, তুমি কি আমাদের এই বৃষ্টির মধ্যে বাইরে দাঁড় করিয়ে রাখবে?"

বিচ্ছু লম্বা জিভ কেটে আমাদের বাড়ির ভেতরে নিয়ে গেল। বিচ্ছু গত তিন বছরে একদম বদলায়নি। আগে ঠিক যেমনটি ছিল, তেমনটি আছে। কালো মিশমিশে চেহারা, খাড়া খাড়া চুল। চোখে দুষ্টুমি খেলে যাচ্ছে প্রতিমুহূর্তে। তিন বছর আগে ছেলেটার বয়স ছিল দশ বছর। তার মানে সে এ বছর তেরোতে পা দিয়েছে। কিন্তু শারীরিকভাবে একদম বাড়েনি সে।

খুব ছোটবেলা থেকে বিচ্ছু নানাবাড়িতে আছে। বিচ্ছুর মা এ বাড়িতে ঝিয়ের কাজ করত। বিচ্ছুর বাবা মারা গিয়েছিল সে জন্ম নেবার আগেই। বিচ্ছুর বয়স যখন সাত, তখন তার মা বাজারের কাছে সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যায়। নানু তখন বলেছিলেন, "এতিম ছেলেটার যখন যাবার কোথাও নেই, আমার কাছেই থাক।"

সেই থেকে বিচ্ছু এ বাড়িতে। নানুর ফুটফরমাইশ খাটে। এটা-ওটা এনে দেয়।

—"এতদিন পর আমাকে চিনলি কি করে বিচ্ছু?" বিচ্ছুর হাত থেকে গামছা নিয়ে জিজ্ঞেস করলাম। ছেলেটা মহাচালাক। এরই মধ্যে ছুটে দুটো গামছা নিয়ে এসে আমাকে আর ফারিয়াকে দিয়েছে।

আমার প্রশ্ন শুনে বিচ্ছু দাঁত বের করে বলল, "কি যে কন মামা। আপনেরা শহরে থাইকা আমরারে ভুইলা গেলে কি হইব, আমরা তো আপনেগো ভুলি নাই।"

গামছা দিয়ে চুল ভালো করে মুছে চারদিকে তাকিয়ে কপাল কুঁচকে জিজ্ঞেস করলাম, "নানু কোথায়? ওনাকে দেখছি না কেন?"

বিচ্ছুর চোখ কপালে উঠল, "হায় আল্লাহ! আপনে খবর পান নাই? নানী তো গত মাসে ইন্তেকাল করছেন।"

এবার চোখ কপালে ওঠার পালা আমার। আহত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলাম, "বলিস কি? কিভাবে?"

—"হেডিস রোগে আক্রান্ত হয়ে?" ফারিয়া মাঝখান দিয়ে জিজ্ঞেস করল।

—"না মামা। ওই ব্যারামে নানী মরে নাই।" বিচ্ছু বিষণ্ন কণ্ঠে জবাব দিল, "গত মাসে নানীর খুব জ্বর হইছিল। অনেক চেষ্টা করছি। জ্বর কমাইতে পারি নাই।

কারো কাছে যে সাহায্য চামু, তারও উপায় নাই। সাহায্য করণের মতো মানুষ কই? তিনদিনের মাথায় নানীর জবান বন্ধ হইয়া গেল। হেইদিন থাইক্যা খাওন-দাওনও বন্ধ কইরা দিল। আমার চোখের সামনে নানী না খাইয়া, শুকাইয়া মইরা গেল।" বিচ্ছু চোখের জল মুছল।

—"এ তুই আমাকে কি খবর দিলি বিচ্ছু?" খাটের ওপর ধপ করে বসে পড়লাম। নানু বেঁচে নেই– তা কি করে সম্ভব?

ফারিয়া আমার পাশে এসে বসল। সান্ত্বনা দেবার জন্য। হঠাৎ একটু ক্ষেপে গেলাম। দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে বললাম, "আর বজলু? ওই হারামজাদা কই? তার না নানুর দেখাশোনা করার কথা? নানুর কিছু হলে সে খবর ঢাকায় দেবার দায়িত্ব তার ছিল না?"

—"সে নাই মামা।" বিচ্ছু চাপা গলায় বলল।

—"নেই মানে? কোথায় গেছে সেই হারামজাদা?"

—"বজলু ভাই কয়েক মাস আগে হেই ব্যারামে ভুইগা মইরা গেছে মামা। তার শইল পুড়াবার সময় আমিও সেইখানে ছিলাম।"

আমার মাথাটা ঘুরে উঠল একবার। আমার সকল আত্মীয়স্বজনের মধ্যে একমাত্র নানুই জীবিত ছিলেন। এখন তিনিও আমাকে ফাঁকি দিয়ে চলে গিয়েছেন।

—"নানীর কবরটা কই বিচ্ছু?" দরজার চৌকাঠে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

—"বাড়ির পিছনে ক্ষেতের পাশে মামা।"

—"চল তো, দেখে আসি।" আমি বাইরে যেতে উদ্যত হলাম।

বিচ্ছু হাহাকার করে উঠল, "এখনি যাইবেন মামা? বাইরে তো বৃষ্টি হইতাছে। বেশি ভিজলে জ্বর আইস্যা যাইব। বৃষ্টি একটু কইমা আসুক মামা। তখন যাইবেন।"

—"না"। আমি অবুঝের মতো আচরণ করলাম। "আমি এখনি যাব।"

ফারিয়াকে বললাম, "তুমি কাপড় বদলে ফেল।" তারপর বিচ্ছুকে প্রশ্ন করলাম, "ওর জন্য শুকনো কাপড়ের ব্যবস্থা করতে পারবি?"

—"জি মামা। পাশের ঘরের আলমারিতে নানীর অনেক শাড়ি আছে। আপা হেইগুলার যে কোনো একটা পরলেই হইব।"

ফারিয়া শাড়ি বদল করতে পাশের ঘরে চলে গেল। বিচ্ছু দেরাজের ওপর থেকে বড় একটা ছাতা নামিয়ে বলল, "চলেন মামা। এইবার বৃষ্টি আমরার কিছুই করতে পারব না।"

বিচ্ছুর হাত থেকে ছাতা নিয়ে আমি মেলে ধরলাম। বেশ বড় ছাতা– দু'জনেরই দিব্যি জায়গা হয়ে গেল। নানুর ছোট্ট কবরটা কঞ্চির বেড়া দিয়ে ঘেরা। কবরের সামনে দাঁড়িয়ে রইলাম কয়েক মুহূর্ত। দোয়া করলাম ওনার জন্য।

বিচ্ছুই প্রথম নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করল। "বাসার অন্যরা কেমন আছে মামা?"

—"ওরা কেউই বেঁচে নাই রে বিচ্ছু। সবাই মারা গেছে।" আমি জানালাম, "এখন তোর খবর বল। এতদিন এখানে একা থেকেছিস কি করে?"

—"আর কই যামু মামা।" বিচ্ছু পায়ের নখ দিয়ে ভেজা মাটি খুঁটতে খুঁটতে বলল, "আমার কি যাওনের কোনো জায়গা আছে?"

—"একা থাকতে তোর ভয় করে না?"

—"করে না আবার মামা? খুব ভয় করে। রাইত হইলে একদম বের হই না। ওগুলো কি জানি কয়... হ, না-মানুষগুলো মাঝে মইধ্যে রাতবিরাতে উঠানের ওপর দিয়া হাইট্যা যায়। খুব ডর করে তখন। দরজা-জানালা সব বন্ধ কইরা রাখি।"

—"তোদের এখানে তো এখন বিদ্যুৎ নাই। রাতের অন্ধকারে থাকিস কি করে?"

—"হারিকেন জ্বালায় রাখি। একটা মুদি দোকান থাইকা কিছু মোমবাতিও তুইলা নিয়া আইসি মামা। দরকার পড়লে সেগুলোরেও কাজে লাগাই।"

—"একটা কথা বল তো, আসার সময় দেখলাম পুরো কুমিল্লা শহর খালি। গ্রামেও কাউকে চোখে পড়ল না। ঘটনাটা কি?"

—"মানুষ দেখবেন ক্যামনে মামা"! বিচ্ছু আমার আরেকটু কাছে ঘেঁষে দাঁড়াল। "হয় মইরা গেছে, নয়তো চইলা গেছে না-মানুষগুলো উৎপাতে।"

—"কোথায় গিয়েছে?"

—"জানি না মামা। ওই দেখেন", বিচ্ছু সামনে আঙুল দিয়ে দেখাল, "ওই যে, ক্ষেতের ওই পাশে একটা ঘর দেখতাছেন না? ওইটাতে জিল্লুর ভাইয়ের পরিবার ছিল অনেক দিন। হেরাও নানী মারা যাওয়ার পর ঘর ছাইড়া চইলা গেছে। কই গেছে খোদায় জানে।"

—"চল বিচ্ছু, ফিরে যাই এবার।"

কবর ছেড়ে চলে আসার সময় একবার পেছন ফিরে তাকালাম। "আমাকে ক্ষমা করে দিও নানু।" মনে মনে বললাম, "আমার বড়ই দুর্ভাগ্য, তোমার শেষ সময়েও পাশে থাকতে পারিনি।"

বৃষ্টি একদম কমে গিয়েছে, ছাতাটা বন্ধ করে ফেললাম। দেখি, ফারিয়া উঠোনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে আমাদের জন্য। তার পরনে নানুর সাদা শাড়িগুলোর একটা। দেখতে ভালোই লাগছে।

—"ভাইয়া, আর কোনো কথা শুনব না। এখুনি ভেতরে ঢুকে শিগগির জামা-কাপড় বদলে ফেলুন। জ্বর না বাধিয়ে ছাড়বেন না দেখছি।" ফারিয়া কপট রাগ করার ভঙ্গি করে বলল।

ভেতরে ঢুকে দেখি ফারিয়া এরই মধ্যে ব্যাগ খুলে খাটের ওপর একটা জামা আর প্যান্ট রেখে দিয়েছে। ভাগ্য ভালো যে ব্যাগ ওয়াটার প্রুফ ছিল। নয়তো জামাকাপড়, খাবার-দাবার সব ভিজে একাকার হয়ে যেত।

—"আমি বাইরে অপেক্ষা করছি। আপনি কাপড় বদলে ফেলুন।" ফারিয়া উঠোন থেকে ডাক দিয়ে বলল।

—"ঠিক আছে।" গা থেকে একটানে ভেজা শার্টটা খুলে বিচ্ছুর হাতে দিয়ে বললাম, "যা এটা কোনো দড়িতে ঝুলিয়ে দে। শুকিয়ে যাক।"

বিচ্ছুর তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া আমাকে চমকে দিল। সে কয়েক মুহূর্তে বিস্ফারিত দৃষ্টিতে চেয়ে রইল আমার গায়ের দিকে; তারপর গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে পাগলের মতো এক দৌড়ে বের হয়ে গেল বাড়ি থেকে।

ফারিয়া ছুটে এলো, "কি হয়েছে ভাইয়া? ও এরকম করে ছুটে পালিয়ে গেল কেন?"

আমি আমার বুকের দিকে আঙুল দিয়ে দেখালাম "ও এইসব দাগ দেখে পালিয়েছে।"

—"ওহ্ খোদা।" ফারিয়া কপাল দু'হাত দিয়ে চেপে ধরে খাটের ওপর বসে পড়ল। "ও এখন লোকজন ডেকে নিয়ে আসবে না তো? আমার মনে হয় আপনার আর এক মুহূর্তও এখানে থাকা উচিত নয়। চলুন, এখান থেকে পালাই। অন্য কোথাও আশ্রয় নেয়া যাবে।"

—"চিন্তা করো না ফারিয়া", আমি তাকে বোঝালাম। "বিচ্ছু কখনোই এমন কাজ করবে না। দেখো ও ঠিকই একসময় ফিরে আসবে।" বলেই জোরে তিনবার টেনে টেনে হাঁচি দিলাম।

—"দেখি!" ফারিয়া উঠে এসে আমার কপালে হাত রাখল। "ইস! বলেছিলাম না, জ্বর আসবে।"

—"খুব বেশি জ্বর বলে মনে হচ্ছে?" অনেকক্ষণ ধরেই আমার মাথাটা ভারী ভারী লাগছিল, কিন্তু ব্যাপারটা তখন আমলে নেইনি।

—"বেশি মানে? কপাল পুড়ে যাচ্ছে। জলদি ভেজা প্যান্ট বদলে শুয়ে পড়ুন। আমি রান্নাঘরে যাই। দেখি, কোনো খাবার আছে কি-না। গরম গরম খাবার খাওয়া আপনার দরকার।"

—"এত ব্যস্ত হবার দরকার নেই। তাছাড়া তুমি রান্না করবে কি করে? চুলোর গ্যাস নেই হয়তো।" ক্লান্ত গলায় বললাম। এখন সত্যিই জ্বর জ্বর লাগছে।

—"গ্যাস না থাকলে লাকড়ি দিয়ে চুলো ধরাব। আপনি কথা না বাড়িয়ে শুয়ে পড়ুন তো। আপনার চোখও বেশ লাল হয়েছে।" বলে ফারিয়া রান্নাঘরের দিকে চলে গেল।

শুকনো প্যান্টটা পরে নিলাম। ভেজা প্যান্ট খাটের পাশে মেঝেতে পড়ে রইল। এতক্ষণ মনে হয় আমার অনুভূতির অসার হয়েছিল। এখন বেশ বুঝতে পারছি, জ্বর আসছে। খাটের কোণে একটা চাদর ভাঁজ করা ছিল, অনেক কষ্টে সেটা টেনে গায়ের ওপর বিছিয়ে দিলাম। চোখ খুলে রাখতেও এখন খুব কষ্ট হচ্ছে। সারা শরীরে গাঁটে গাঁটে ব্যথা করছে।

খুব ঘুম পাচ্ছে। একটু ঘুমিয়ে নেই। চোখের পাতার ওপর কেউ যেন ভারী পাথর চাপা দিয়ে রেখেছে। ফারিয়া ডাকছে কি? ডাকুক। ওর ডাকের জবাব দেবার শক্তি আমার নেই। আমি এখন ঘুমাব।

॥ ছয় ॥

—"আপা, ও আপা! মামা, দরজা খোলেন।"

—"কে, বিচ্ছু নাকি? তুমি ফিরে এসেছ?" ফারিয়া হারিকেন হাতে উঠোনে বের হয়ে এলো।

বিচ্ছু ফিরে এসেছে। এখন অনেক রাত। ফারিয়া সূর্য ডোবার সাথে সাথে দরজা-জানালা সব বন্ধ করে দিয়েছিল। নাজমুল বিছানার ওপর অচেতনপ্রায় অবস্থায়

পড়ে আছে। গায়ে এখনও খুব জ্বর। ফারিয়া কয়েকবার চেষ্টা করেছিল ওকে জাগাতে। যা খাবার ভাড়ারে ছিল, সেগুলো দিয়ে এক ধরনের জাউ রেঁধেছে। চেয়েছিল গরম গরম জাউ নাজমুলকে খাওয়াতে। পারেনি।

এতক্ষণ সে চুপচাপ বসে ছিল নাজমুলের পাশে। কিছুক্ষণ পর পর কপালে হাত দিয়ে দেখছিল জ্বর কমেছে কি-না বোঝার জন্য। একটা থার্মোমিটার থাকলে বড়ই ভালো হতো। হঠাৎ বাইরে বিচ্ছুর হাঁকডাক শুনে সে উঠে এসেছে।

—"আমারে মাফ কইরা দেন আপা।" বিচ্ছু লজ্জিত কণ্ঠে বলল।" মামার ব্যারামের কথা আমি জানতাম না। আচানক যখন মামার গায়ে দাগগুলা দেখলাম, তখন মাথাডা ওলট-পালট হইয়া গেল। পলায় গেলাম। নিজেরে একসময় বুঝ দিলাম, ওরে বিচ্ছু! মরলে তুই একদিন মরবিই। হেইটা আজ হোক কাইল হোক মরতে তোরে হইবই। যা তুই এখনি ফিরা যা। ফিরা গিয়া মাফ চা মামার কাছে, আপার কাছে।"

—"ভেতরে আসো বিচ্ছু", ফারিয়া হারিকেন নিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল।

বিচ্ছু দরজা লাগিয়ে দিয়ে ঘুরে খাটের ওপর নাজমুলকে দেখে আঁতকে উঠল।

—"কি হইছে মামার? ওনার চেহারা এরকম দেখাইতেছে কেন?"

—"ভাইয়ার খুব জ্বর। কত বার বলেছিলাম, ভেজা কাপড় বদলে ফেলতে। শুনল না। বিচ্ছু, তুমি ওনাকে জাগাবার চেষ্টা করো। কিছু খাবার তৈরি করেছি। দেখি, এখন খাওয়ানো যায় কি-না।"

বিচ্ছু নাজমুলের গায়ে হাত রাখল। "গায়ে তো আগুন ধইরা আছে। মামা, ও মামা! চোখ খুলেন মামা! দেখেন, আমি বিচ্ছু। আমি ফিরা আইছি মামা।"

নাজমুল নড়েচড়ে উঠল। অনেক কষ্টে ফোলা চোখ খুলে জড়ানো স্বরে বলল, "বাবা?"

—"না মামা। আমি.....আমি বিচ্ছু।"

নাজমুল বিড়বিড় করে কি যেন বলে আবার চোখ বন্ধ করে ফেলল।

—"জাগাতে পেরেছিলে বিচ্ছু?" ফারিয়া বাটি ভর্তি জাউ নিয়ে ফিরে এসেছে।

—"একবার চোখ খুলছিল আপা। কিন্তু আমারে চিনতে পারল না। ওনার বাপেরে ডাকল। কি করি বলেন তো আপা?"

ফারিয়া নাজমুলের কপাল স্পর্শ করে বলল, "জ্বর কমানো দরকার। তুমি এসেছ, ভালো হয়েছে। যাও, এক বালতি পানি নিয়ে আসো। সাথে একটা মগ। ওনার মাথায় পানি ঢেলে জ্বর কমাতে হবে।"

—"জি আপা। আমি এখনি নিয়া আসতেছি।" বিচ্ছু ছুটে গেল বালতি আনতে।

ঘণ্টা দুয়েক নাজমুলের মাথায় পানি ঢালল ওরা। একসময় নাজমুলকে চোখ খুলতে দেখে বিচ্ছুকে পানি ঢালা থামাতে বলল ফারিয়া। কপালে হাত দিয়ে দেখল, জ্বর কমে গিয়েছে।

—"এখন কেমন লাগছে আপনার?" ফারিয়া জিজ্ঞেস করল।

—"মাথায় খুব ব্যথা। ঘাড় মনে হচ্ছে ছিঁড়ে যাবে।" নাজমুল ফিসফিস করে জবাব দিল।

—"একটু পানি খান।" নাজমুলের মুখে ফারিয়া পানির গ্লাস ধরে অনুরোধ করল।

ঢকঢক করে অনেকটুকু পানি খেল নাজমুল। জাউ কিছুতেই মুখে দিতে চাচ্ছিল না। বলছিল মুখে দিলেই পেট উল্টে সব বের হয়ে যাবে। তারপরও অনেক কষ্টে বুঝিয়ে ফারিয়া নাজমুলকে কয়েক চামচ জাউ খাওয়াতে পারল। জাউ খেয়ে নাজমুল শুয়ে পড়ে মুহূর্তের মধ্যে ঘুমিয়ে গেল।

—"রাত অনেক হইছে আপা। আপনি পাশের ঘরে গিয়া শুইয়া পড়েন। আমি এখানে মামার লগে আছি", বিচ্ছু হাই তুলে বলল।

ফারিয়ারও খুব ক্লান্তি লাগছিল। কোনো দরকার পড়লেই ডাকার নির্দেশ দিয়ে পাশের ঘরে বিছানার ওপর শুয়ে পড়ল সে। নাজমুল বেচারা এখানে এসেছিল কয়েকটা দিন শান্তিতে বেঁচে থাবার জন্য। তা বোধহয় আর সম্ভব হবে না।

পরদিন আবারও নাজমুলের জ্বর বাড়ল। অনেকক্ষণ তার কোনো হুঁশ ছিল না। ফারিয়া ওর ব্যাগ অনেকবার ঘেঁটেছে, কিন্তু সেটার ভেতর কাপড়চোপড়, গুলির বাক্স আর ওই পিস্তলটা ছাড়া আর কিছুই নেই। সারা ঘর তন্নতন্ন করে খুঁজল সে। কোনো ওষুধপত্র খুঁজে পেল না।

—"নানীর কোনো ওষুধের বাক্স ছিল না?" একসময় সে বিচ্ছুকে জিজ্ঞেস করল।

—"ছিল আপা। সেইটা তো নানী ইন্তেকাল করার পর ফালায় দিছি।"

—"অনেক বড় ভুল করেছ। ওটার ভেতর হয়তোবা প্যারাসিটামল থাকতে পারত। এখানে আশপাশে কোনো ফার্মেসি আছে?"

—"ওষুধের দোকান? না আপা। দোকান তো সব শহরে।" বিচ্ছু চিন্তিত মুখে জবাব দিল।

—"যাও না লক্ষ্মী ভাইটা।" ফারিয়া বিচ্ছুর পিঠে হাত বুলিয়ে বলল। "সাইকেলটা চড়ে তুমি শহরে চলে যাও। প্যারাসিটামল দেখলে চিনতে পারবে?"

—"জি আপা, পারুম না ক্যান। আমি তো মুখ্যু না। নানী নিজে আমারে পড়তে লিখতে শিখাইছেন। আপনি মামার দিকে খেয়াল রাখেন। আমি এই যামু আর আসমু।"

বিচ্ছু চলে যাবার পর ফারিয়া খাটের পাশে মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসল। নাজমুলের হুঁশ ফিরছে। কিন্তু সে ক্রমাগত প্রলাপ বকে যাচ্ছে। চোখেও ভুল দেখছে হয়তো। ফারিয়াকে সে দেখেও দেখছে না। একবার তো 'মা' বলে শক্ত করে ফারিয়ার হাত চেপে ধরেছিল।

ফারিয়া হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে চোখের পানি মুছল। নাজমুল বোধহয় হেডিস রোগের তৃতীয় পর্যায়ে চলে গিয়েছে। ফারিয়ার বাবাও মারা যাবার দু'দিন আগে ক্রমাগত উল্টোপাল্টা বকতেন, চোখে ভুল দেখতেন।

এখন কেবল প্রহর গোনার পালা। বিচ্ছু প্যারাসিটামল নিয়ে ফেরার সাথে সাথে ফারিয়া জোর করে দুটো ট্যাবলেট নাজমুলকে খাইয়ে দিল।

নাজমুল ভুল বকেই চলেছে। চোখ খুললেও সে সামনে অদৃশ্য কারো সাথে কথোপকথন চালিয়ে যাচ্ছে। বিচ্ছু নাজমুলের মাথায় হাত বুলিয়ে ধরা গলায় বলল,

"আমরার এই মামাটা খুবই ভালো মানুষ আপা। ওনার বোধহয় আর খুব বেশি দেরি নাই। তাই না আপা? আমরার বজলু ভাইরেও দেখিছি, ব্যারাম হইয়া মরার আগে উল্টাপাল্টা করতে।"

রাত বারোটা নাগাদ নাজমুলের জ্বর পুরোপুরি সেরে গেল। ফারিয়া তখন নাজমুলের পাশে বসে শূন্য দৃষ্টিতে সামনে তাকিয়ে ছিল। বিচ্ছুটা পায়ের কাছে মাটিতে শুয়ে অঘোরে ঘুমাচ্ছে। নাজমুলের ডাক শুনে ফারিয়ার ঘোর ভেঙে গেল।

—"ভাইয়া! এখন কেমন লাগছে আপনার?"

—"ভালো", নাজমুল ক্ষীণ কণ্ঠে জবাব দিল। "এখন ক'টা বাজে?"

—"রাত বারোটা ভাইয়া।"

নাজমুল কনুইয়ে ভর দিয়ে উঠে বসল। ফারিয়া বাধা দেবার চেষ্টা করল, "উঠবেন না ভাইয়া। আপনার শরীর এখনো অনেক দুর্বল। মাথা ঘুরে পড়ে যাবেন।"

—"প্লিজ ফারিয়া। তোমাকে আমি জরুরি কিছু কথা বলতে চাচ্ছি। আমার পেছনে আরো দুটো বালিশ দিয়ে দাও।"

নাজমুলের অনুরোধ ফারিয়া অগ্রাহ্য করতে পারল না। দুটো বালিশের ওপর হেলান দিয়ে বসে নাজমুল ফারিয়ার হাত চেপে ধরল।

—"বসো ফারিয়া। তোমাকে কিছু কথা বলব এখন। কিন্তু...আমার পিস্তলটা কোথায়?"

—"আপনার ব্যাগের ভেতর ভাইয়া।"

—"নিয়ে আসো তো।"

—"ওটা আপনার এখন লাগবে কেন?" ফারিয়া অবাক হলো।

—"আহ্। কথা বাড়াবে না। যা বলছি করো, নিয়ে আসো ওটা। আমি কতক্ষণ ভালো থাকব ঠিক নেই। এখনি মাথার ভেতর পাগল পাগল লাগছে। তোমাকে মাঝেমধ্যেই অন্য কেউ বলে ভুল করছি। যাও, পিস্তলটা এনে দাও আমাকে।"

ফারিয়া পিস্তল এনে দেবার পর নাজমুল সেটাকে একনজর দেখল। চেম্বারে ছ'টা গুলিই ভরা আছে।

—"পিস্তল চালাতে জানো?" নাজমুল হঠাৎ জিজ্ঞেস করল।

—"না তো। কেন?" ফারিয়ার আবার অবাক হবার পালা।

—"তাহলে দেখে নাও কিভাবে এটা ব্যবহার করতে হয়। এটা হলো ট্রিগার। নাও, হাতে ধরো এটা। আঙুল রাখো ট্রিগারে।" ফারিয়ার হাতে নাজমুল পিস্তল তুলে দিল।

—"কি করব আমি এটা দিয়ে?" ভারী পিস্তলটা ফারিয়া কাঁপা হাতে অনেক কষ্টে ধরে রেখেছে।

—"এই ট্রিগারে চাপ দিলেই গুলি বের হয়ে আসবে।" নাজমুল বোঝাল। "এখন তোমাকে একটা অনুরোধ করব, তুমি যেহেতু আমাকে তোমার ভাই ডেকেছ, আশা করছি আমার এই অনুরোধ তুমি রাখবে।"

—"কি অনুরোধ?" ফারিয়া ভয়ার্ত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল। সে এরই মধ্যে আন্দাজ করে ফেলেছে নাজমুল তাকে কি বলতে যাচ্ছে।

—"আমার হাতে সময় বেশি নেই। আমার ডাক্তার আমাকে বলেছিলেন বড়জোর এক সপ্তাহ বাঁচতে পারব। কিন্তু, মনে হচ্ছে আমার সময় ফুরিয়ে এসেছে। হয়তো খুব বেশি হলে আর দু'একদিন বেঁচে থাকব আমি।"

নাজমুল বুক ভরে শ্বাস নিল। "আমি না-মানুষ হয়ে ফিরে আসতে চাই না ফারিয়া। এক সময় মনস্থির করেছিলাম মারা যাবার আগমুহূর্তে নিজেই নিজেকে গুলি করে আত্মহত্যা করব। কিন্তু এখন সে সাহস পাচ্ছি না। আমি খুব ভীরু ফারিয়া। আমি খুবই ভীরু একজন মানুষ।"

—"আমি জানি আপনি আমাকে কি অনুরোধ করবেন", ফারিয়া কান্নাজড়ানো গলায় বলল। "আমি এ কাজ করতে পারব না।"

—"কিন্তু তোমাকে করতেই হবে" নাজমুল আরেকটু সোজা হয়ে বসল। "তুমি ছাড়া আর কেউই নেই। বিচ্ছুকে আমি এই কাজ করতে দিতে পারি না। ও পারবে না। পারবে কেবল তুমি।"

—"আপনি মারা যাবার পর বিচ্ছু লোকজন ডেকে আনবে। ওরাই আপনার দেহ পুড়িয়ে ফেলবে। আপনাকে না-মানুষ হয়ে ফিরে আসতে হবে না।

—"বোকার মতো কথা বলো না।" নাজমুল ধমকের সুরে বলল। "আমি কোনো রকম ঝুঁকি নিতে চাচ্ছি না। যদি ও সময়মতো লোক জোগাড় না করতে পারে? তাছাড়া তখন সাহায্য করবে এমন লোক আশপাশে তুমি পাবে কোথায়?"

–"তারপরও, আমি পারব না", ফারিয়া অন্যদিকে তাকিয়ে বলল।

–"তুমি পারবে। তোমাকে অবশ্যই পারতে হবে। আমি অনুরোধ করছি তোমাকে। অনুরোধ করছি আমার বোনকে। আমি চাই– যেদিন আমি মারা যাব, সেদিন তুমি বিন্দুমাত্র সময় নষ্ট না করে পিস্তলটা আমার কপালে তাক করে গুলি করবে। পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জে গুলি করবে, নিশানা ফসকে যাবার কোনো সম্ভাবনা থাকবে না। কি, পারবে না?"

–"না!" ফারিয়া পিস্তল নাজমুলের কোলের ওপর ফেলে দিল। "এই অনুরোধ করার কোনো অধিকার আপনার নেই। আমি কিছুতেই এ কাজ করতে পারব না।"

নাজমুল চোখ বন্ধ করে দীর্ঘশ্বাস ফেলল। "আমি না-মানুষ হয়ে ফিরতে চাই না ফারিয়া।"

–"আমি ঘুমাতে যাচ্ছি।" ফারিয়া উঠে দাঁড়াল। "আপনিও শুয়ে পড়ুন। কিছু লাগলে ডাক দেবেন।"

ফারিয়া চলে যাবার পরও নাজমুল অনেকক্ষণ সামনে চেয়ে থাকল। মারাত্মক দৃষ্টিবিভ্রম হচ্ছে তার। পুরো ঘর জুড়ে বিভিন্ন পরিচিত, অপরিচিত মুখ দেখতে পাচ্ছে সে। ওরা গল্প করছে, বিছানায় এসে বসছে। মাঝে মাঝে ঝগড়াও করছে। নাজমুলের সাথে কথা বলার চেষ্টা করছে ওদের কয়েকজন, কিন্তু নাজমুল উত্তর দেয়নি। সে জানে, সে যা যা দেখছে তা সবই তার চোখের ভুল।

॥সাত॥

পরদিন সকালে ফারিয়ার ঘুম ভাঙল বিচ্ছুর চিৎকার শুনে।

—"আপা! ও আপা! জলদি আসেন। মামা কেমন জানি করতাছে!"

ফারিয়া গিয়ে দেখে নাজমুল ব্যথায় ছটফট করছে। সারা শরীর নীল হয়ে গিয়েছে ব্যথায়। ঘামে কাপড়চোপড় ভিজে গিয়েছে।

—"ভাইয়া!" ফারিয়া ছুটে গেল নাজমুলের পাশে। "কি হয়েছে আপনার? কখন থেকে এ অবস্থা?"

—"আমার ঘুম ভাঙছে মামার ডাক শুইনা। উইঠা দেখি, মামা বিছানার মধ্যে পইড়া কেমন জানি করতেছে।

—"ভাইয়া!" ফারিয়া নাজমুলের ডান হাত শক্ত করে ধরল। "চোখ খুলুন। আপনার কি খুব কষ্ট হচ্ছে?"

নাজমুল অনেক কষ্টে চোখ খুলল। বড় বড় শ্বাস ফেলছে সে। দাঁতে দাঁত চেপে অস্ফুট স্বরে জবাব দিল, "সারা গা ছিঁড়ে যাচ্ছে। কষ্ট সহ্য করতে পারছি না ফারিয়া। কিছু একটা করো।"

ফারিয়া নাজমুলকে জড়িয়ে ধরল। নাজমুলের দেহ মারাত্মকভাবে কাঁপছে। তাকে ধরে রাখতেই ফারিয়ার ঘাম ছুটে গেল। নাজমুল সামনের দিকে ঝুঁকে শুকনো কাশি কাশল কয়েকবার। নাক থেকে এক ঝলক রক্ত বের হয়ে এলো।

—"বিচ্ছু। জলদি একটা গামছা নিয়ে আসো", ফারিয়া রক্ত দেখে চমকে গেল। বিচ্ছু দৌড়ে গেল গামছা আনতে।

বিচ্ছু গামছা আনার আগেই ফারিয়া শাড়ির আঁচল নাজমুলের নাকে চেপে ধরল। মুহূর্তে সাদা শাড়ি রক্তে ভিজে লাল হয়ে গেল। গামছা আনার পর সেটা দিয়ে নাজমুলের নাক থেকে নির্গত রক্ত ভালো করে ফারিয়া মুছে দিল।

নাজমুলের মনে হচ্ছিল তার দেহ কেউ যেন যাঁতাকলের ভেতর ঢুকিয়ে পিষে ফেলছে। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, "আমাকে মুক্তি দাও তোমরা। মেরে ফেল আমাকে, আমার খুব কষ্ট হচ্ছে!"

ফারিয়া এ কথার কোনো জবাব দিল না। নাজমুলকে শক্ত করে ধরে বসে রইল। থেকে থেকে কেঁপে উঠছে নাজমুলের দেহ। আর খুব একটা বেশি দেরি নেই। নাজমুলের সকল দুঃখ-কষ্ট কয়েক ঘণ্টার মধ্যে পাকপাকিভাবে দূর হয়ে যাবে।

বিকেলবেলায় নাজমুলের খিঁচুনি শুরু হলো। বিচ্ছুকে নাজমুলের পাশে রেখে ফারিয়া ঘর থেকে বের হয়ে উঠোনে দাঁড়িয়ে রইল। এ দৃশ্য সে সহ্য করতে পারবে না। বিচ্ছু একসময় উঠে এসে কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, "মামা মইরা যাইতাছে আপা। কিছু একটা করেন।

ফারিয়া বিচ্ছুকে কাছে টেনে নিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরল। ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল ছেলেটা। ঘরের ভেতর থেকে নাজমুলের আর্তনাদ ভেসে আসছে। ফারিয়া বিচ্ছুর মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলল, "কেঁদো না। ওনাকে আর বেশিক্ষণ কষ্ট পেতে হবে না। কেঁদো না বিচ্ছু।"

সন্ধ্যা সাতটায় মারা যাবার ঠিক আগ মুহূর্তে নাজমুল ফারিয়ার নাম ধরে ডাকল। ফারিয়া তখনো উঠোনে অন্ধকারে বসে ছিল। না-মানুষেরা অন্ধকারে তাকে আক্রমণ করে বসতে পারে– এ বিষয়টা তাকে আর চিন্তিত করছে না। সে আজ সকল ভয়ভীতির ঊর্ধ্বে চলে গিয়েছে। আশ্চর্য রকম শান্ত বোধ করছে সে।

—"আপা!" বিচ্ছু ফারিয়াকে ডাকল।

—"হুঁ?" ফারিয়া আকাশের চাঁদের দিকে তাকিয়ে ছিল। বিচ্ছুর ডাক শুনে ফিরে তাকাল। "মামা আপনেরে ডাকে।" মাটির দিকে তাকিয়ে নিচু গলায় বিচ্ছু বলল।

ফারিয়া ভেতরে যেতে চাচ্ছিল না। সে জানে নামজুল তাকে কি বলবে। তারপরও সে গেল। ওর কথাগুলো শুনতে তো কোনো ক্ষতি নেই। ফারিয়াকে আসতে দেখে নাজমুল হাসল। হারিকেনের আলোয় নাজমুলের চোখ জ্বলজ্বল করছে।

—"আমার সময় প্রায় শেষ। আমার জন্য অনেক কষ্ট করলে তুমি।" নাজমুল থেমে থেমে বলল, "এসো, আমার হাতটা ধরো।"

ফারিয়া খাটে নাজমুলের পাশে বসে হাত শক্ত করে চেপে ধরল। নাজমুল ফারিয়ার চোখে চোখ রেখে বলল, "সময় হয়ে গিয়েছে। আশা করছি তুমি আমার অনুরোধটা রাখবে। প্লিজ, আমার শেষ ইচ্ছাটা তুমি পূরণ করো।"

—"ঠিক আছে।" ফারিয়া ভাবলেশহীন কণ্ঠে জবাব দিল।

—"ধন্যবাদ ফারিয়া। তোমাকে অনেক ধন্যবাদ।" নাজমুল স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে চোখ বন্ধ করল। তারপরই হঠাৎ আর একবার খিঁচুনি দেবার পর তার সারা দেহ শিথিল হয়ে গেল। হাতের মুঠো আলগা হয়ে খাটের ওপর পড়ে গেল।

বিচ্ছু ডুকরে কেঁদে উঠল। ফারিয়া উঠে দাঁড়িয়ে শান্ত গলায় বিচ্ছুকে বলল, "বিচ্ছু, তুমি এখন বাইরে যাও। আমি না ডাকা পর্যন্ত ভেতরে আসবে না।"

—"কি আপা?" বিচ্ছু গেঞ্জির কোণায় চোখ মুছতে মুছতে জিজ্ঞেস করল।

—"বাইরে যাও বিচ্ছু। আমার একটা কাজ বাকি আছে।" ফারিয়া বিচ্ছুর কাঁধে হাত রেখে তাকে বাইরে উঠোনে নিয়ে দাঁড় করাল। তারপর ভেতরে এসে দরজা বন্ধ করে দিল।

নাজমুল পিস্তলটা তার মাথার বালিশের নিচে রেখেছিল। ফারিয়া অস্ত্রটা আস্তে বালিশের নিচ থেকে বের করে নিল। পিস্তলের ধাতব কালো দেহ চকচক করছে।

পিস্তলের নল নাজমুলের কপালে স্পর্শ করল ফারিয়া। নাজমুলকে দেখে মনে হচ্ছে সে যেন ঘুমাচ্ছে। এখনি ডাকলে চোখ মেলে তাকাবে। ফারিয়া ট্রিগারে আঙুল রাখল। কয়েক সেকেন্ড নিল নিজেকে শান্ত করতে। নাজমুল তাকে যে কাজ করার দায়িত্ব দিয়ে গিয়েছে, সে কাজ তাকে শেষ করতেই হবে।

ট্রিগারে চাপ দেবার ঠিক আগ মুহূর্তে অদ্ভুত একটা ব্যাপার তার নজরে এলো। নিশ্চিত হবার জন্য হাত দিয়ে স্পর্শ করল সে। তারপরই ছুটে গেল দরজার দিকে। দরজা খুলে উত্তেজিত কণ্ঠে ডাকল, "বিচ্ছু, জলদি ভেতরে আসো, তাড়াতাড়ি।"

চোখ মেলে তাকালাম। আমি কি স্বর্গে আছি, না নরকে? কিন্তু না....ওই তো, আমার পায়ের কাছে ফারিয়া আর বিচ্ছু বসে আছে। খোলা জানালা দিয়ে সকালের সূর্যের আলো তাদের মুখের ওপর পড়ছে।

—"আমি বেঁচে আছি!" তড়াক করে লাফ দিয়ে উঠে বসে বললাম।

—"হ্যাঁ ভাইয়া। আপনি এখনো বেঁচে আছেন।" ফারিয়া হাসতে হাসতে আমাকে জড়িয়ে ধরে বলল।

বিচ্ছু খুশিতে লাফাতে লাফাতে বলল, "আপাই প্রথম খেয়াল করছে ব্যাপারটা। আমরা তো ভাবছিলাম আপনি বুঝি মইরাই গেছেন। তখন...."

—"দাঁড়াও বাবা, আমাকে বলতে দাও।" ফারিয়া হাসিমুখে বাধা দিল। "গত রাতে আপনি যখন একদম হাত-পা ছেড়ে দিলেন, তখন আমরা দু'জনেই ভেবেছিলাম যে আপনি আর নেই। আপনার নিঃশ্বাস নেয়াও বন্ধ হয়ে গিয়েছিল ভাইয়া।"

—"তারপর?"

—"আপনি আমাকে যে কাজ করতে বলেছিলেন, তা করতে যাচ্ছিলাম", বিচ্ছুর দিকে আড়চোখে তাকিয়ে ফারিয়া বলল। "তখনি আমার নজরে আসে যে আপনার বুক অল্প হলেও ওঠানামা করছে। বুকে হাত রেখে দেখি হার্টবিট পাওয়া যাচ্ছে। তখনি বুঝে গেলাম আপনি মরেননি। এরপর সারা রাত ধরে চেষ্টা করেছি আপনাকে জাগাতে। কিন্তু আপনি যেন এক ধরনের কোমায় চলে গিয়েছিলেন। যাই হোক, এখন বলুন কেমন লাগছে আপনার?"

—"চমৎকার লাগছে।" খাট থেকে নেমে বললাম। "ইনফ্যাক্ট, মনে হচ্ছে আমি পুরোপুরি সুস্থ হয়ে গিয়েছি। কিন্তু সেটা কেমন করে সম্ভব?"

—"মামা, আপনের গায়ের দাগগুলো কিন্তু মিলিয়ে গেছে।" বিচ্ছু হাসতে হাসতে বলল।

—"বলিস কি?" শার্ট খুলে দেখি সত্যিই তাই। খয়েরি ছোপগুলো আর দেখা যাচ্ছে না।

—"আপনিই প্রথম!" ফারিয়া খুশিতে হাততালি দিয়ে বলল, "আপনিই প্রথম মানুষ যে হেডিস রোগকে হারাতে পেরেছে।"

আমি ওদের দু'জনকে আমার দু'পাশে নিয়ে জড়িয়ে ধরলাম। কি খুশি ওরা। আমার চোখ চলে গেল বালিশের পাশে রাখা পিস্তলের ওপর। পিস্তলটা লুকিয়ে ফেলতে হবে.... ওরা কিছু বুঝে ফেলার আগেই! প্রতি মুহূর্তে আমার ভেতর নতুন নতুন অনুভূতি সৃষ্টি হচ্ছে। ওরা তো আর সেটা জানে না। ওরা জানে না, সত্যি সত্যিই আমি মারা গিয়েছিলাম। এও সত্যি আমি আবার বেঁচে উঠেছি। কিন্তু ওরা যেই নাজমুলকে চিনত, সেই নামজুল আমি নই। আমি কোনো না-মানুষও নই। আমার চিন্তা করার ক্ষমতা আছে। আবেগ প্রদর্শনের ক্ষমতা আছে। সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা আছে। আর.... আমাকে একটা কাজ করতেই হবে।

ওদের দু'জনকে জড়িয়ে ধরে রেখেছি আমি। ওদের দেহের তাজা গন্ধ আমার নাকে এসে আঘাত হানছে। এরই মধ্যে ওদেরকে আমার দৃষ্টিতে অন্যরকম লাগছে। মনে হচ্ছে, ওরা দু'জন দুটো বিশাল মাংসপিণ্ড ছাড়া আর কিছুই না। এখন আমার প্রথম কাজ হলো পিস্তলটা সরিয়ে ফেলা। আমাকে হত্যা করার কোনো সুযোগ ওদের দিতে চাই না। তবে, কতক্ষণ আমি নিজেকে সামলে রাখতে পারব জানি না। আমার ভীষণ ক্ষুধা পেয়েছে। ভীষণ ক্ষুধা!

সময়ের সাথে হেডিস জীবাণু আপনা থেকেই বদলে গিয়েছে। বদলে গিয়েছে মানবদেহের ওপর তার প্রভাব। আমি মানুষও নই, না-মানুষও নই। আর আমার কাহিনী এখানেই শেষ নয়। আমার.... আমাদের কাহিনী তো সবে শুরু হলো। কিন্তু প্রথমে একটু খেয়ে নেই। উমম্, পায়ের মাংস সত্যিই খুব সুস্বাদু। হোক না কাঁচা!